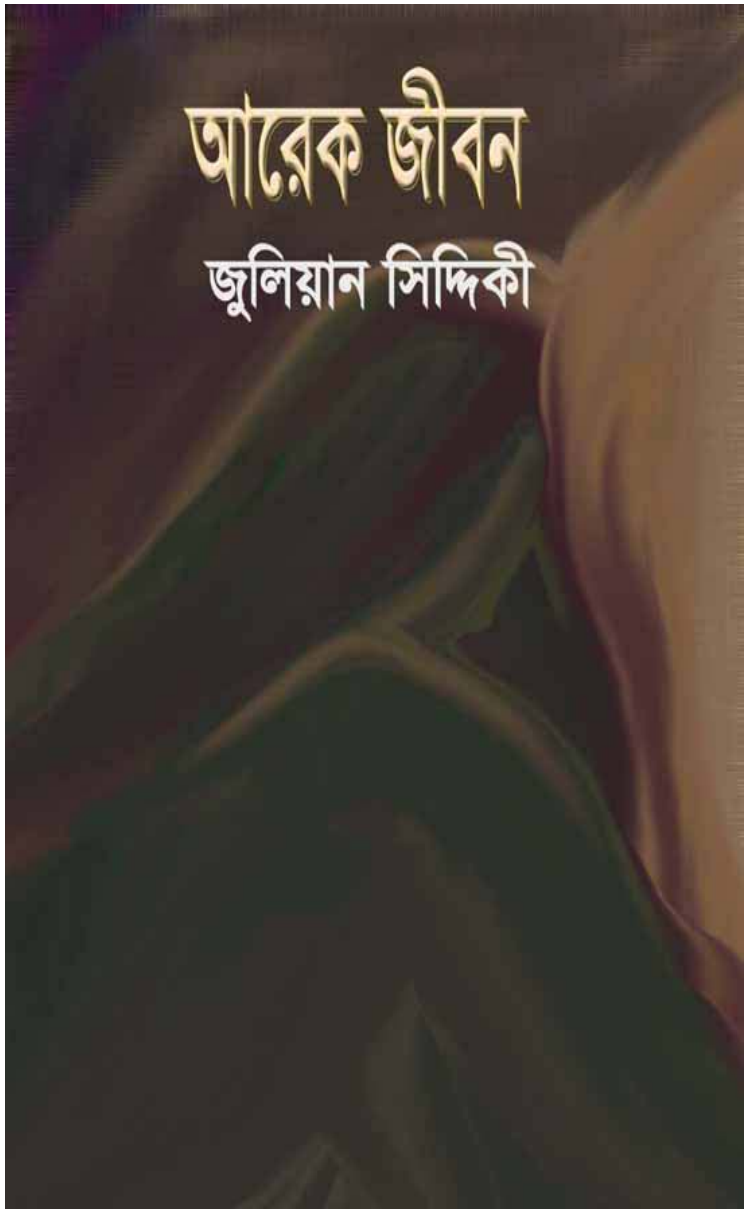

আরেক জীবন

জুলিয়ান সিদ্দিকী

বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
প্রকাশনা, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা

আরেক জীবন
জুলিয়ান সিদ্দিকী

প্রকাশক ঃ
মাহবুবুর রহমান বাবু
বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
৩১/৩২ বাংলাবাজার, পুস্তক ভবন, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৮৯ ৯৯৪৩০৪

প্রথম সংস্করন ঃ অমর একুশে বইমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ:
মোস্তাক আহাম্মদ

©
ইমতিয়াজ গুল মোহাম্মদ

মুদ্রণ ঃ
বি.সি.এস প্রেস
মূল্যঃ ১০০ টাকা

ISBN-984-8211-13-6

উৎসর্গঃ

নাবিকের চোখে আজ
জমাট বেঁধেছে কোন স্বপ্নের মেঘ!
মুখর তরঙ্গোচ্ছ্বাস; রূপালী ফেনায়
নদী আর নারী মাখামাখি ।
নারীর ললাটে আঁকা কোনো এক বিকেলের
হারিয়ে যাওয়া সূর্যালোকে
রঙ ফিরে পেয়েছিলো ছোট্ট কালো টিপ;
লাবণ্য মাখানো সেই শুভ্র চাঁদ-মুখে ।

নীল রঙের গাড়িটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েও আবার ব্যাক করে মিজানের পাশে এসে থামে।

পেছনের সিটে চোখে কাল চশমা পরে স্বাস্থ্যবতী এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বা তারো কিছুটা বেশি হবে। দরজা খুলে দিয়ে মহিলা তাকে আহ্বান করলেন, 'উঠে এস।'

কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল মিজান। কারণ এ মহিলাকে সে চেনে না। এমন কি তার পরিচিত কারো গাড়ি আছে বা গাড়ি নিয়ে চলা-ফেরা করে এমনটাও জানা নেই। কে হতে পারেন এই সুন্দরী? কিন্তু ভেবে কোনো থই পায় না সে।

একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আনে সে। রাস্তার পথ-চলতি উৎসুক মানুষেরা দু-চারজন দাঁড়িয়ে পড়েছে ইতোমধ্যেই। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে কেউ কেউ হয়তো এগিয়ে এসে বলে ফেলবে, এই যে ভাই, ঘটনাডা কি?

কাজেই আপাততঃ মান বাঁচানোর জন্য হলেও বাধ্য হয়ে মিজানকে গাড়িতে উঠে বসতে হয়।

গাড়ি ছেড়ে দিতেই মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ? অনেক দিন পর দেখা। কি বল?'

মিজান ইতস্ততঃ করে শেষটায় আর কিছু বলল না।

মহিলা তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার? চিনতে পারছ না নাকি?'

মিজান অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যিই তাই!'

মহিলা চশমাতে একবার হাত লাগিয়ে আবার নামিয়ে নিলেন।

মিজান ভেবেছিল, মহিলা বুঝি চশমাটা খুলে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না।

ম্যাগডোনাল্ড-এর সামনে এসে গাড়ি থামতেই মহিলা বললেন, 'এস।'

তারপর গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে তিনি আবার পেছন ফিরে তাকালেন। মিজানকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'মিজান! কিছু ভাবছ? আরে ভাই চলে এস তো!'

মিজান এবার নিশ্চিত হয় যে, সে তাকে চিনতে না পারলেও মহিলা তাকে ঠিকই চেনেন।

কে এই মহিলা? আগে কোথাও তাদের দেখা বা পরিচয় হয়েছিল? নাকি ছাত্র-জীবনের পরিচিত কেউ? তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তো কেবল তিনটে মেয়েকেই সে চিনতো। ওদের কেউ আজ এমন অবস্থানে চলে আসতে পারে বলে তার মন সায় দেয় না। আরেকজন ছিল টুসি। বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সে বন্ধুত্বের সীমানা ছিল লেখা-পড়ার বিষয় পর্যন্তই। তবে টুসির তো বাংলাদেশে আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই। স্বামী সহ সিটিজেনশিপ নিয়ে থাকে ইটালিতে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সেও ভদ্র মহিলার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে।

আলো-আঁধারিতে ছাওয়া রুমের একদম কোণার দিকে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন সেই মহিলা।

মিজান চেয়ার টেনে বসতেই তিনি বললেন, 'শুরুটা কি দিয়ে করতে চাও? ঠান্ডা না গরম?'

'একটা হলেই হল!'

ভনিতা না করেই বলল মিজান।

মহিলা হাসলেন। 'একই রকম আছ দেখছি!'

মিজান বলল, 'মানুষ কি বদলায়?'

'কেউ কেউ বদলায়। কেবল তোমাকেই দেখলাম একই রকম রয়ে গেছ!'

'রকম-ফের অবশ্যই আছে। স্বভাবটা কেবল বদলায়নি!'

ওয়েটার এসে দুটো কফির অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই মহিলা তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। আর তখনই মিজান বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার দিয়ে বলে, 'আরে টুসি! কবে এলি? তোর হাজবেন্ডের খবর কি? বাচ্চা-কাচ্চা?'

টুসি হাত নেড়ে বলল, 'রোসো রোসো! এত কথার জবাব এককথায় পাবে না। আস্তে-ধীরে জিজ্ঞেস করো।'

এবার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসে মিজান। তুই তো সাইজের দিক দিয়ে একেবারে জাম্বো হয়ে গেছিস। চশমাটা না খুললে মনে হয় তোকে সারা জীবনেও চিনতে পারতাম না!'

'তাহলে মনে রেখেছো? এ জন্যে ধন্যবাদ! '

মিজান বলল, 'মনে রাখাটা কি খুবই জরুরি ছিল?'

কফি চলে এল।

কফির মগে হাত রেখে টুসি বলল, 'মনে রাখাটা শুধু জরুরিই ছিল না, এতে আমার অস্তিত্বের একটা ব্যাপারও জড়িয়ে আছে।'

'কি রকম?'

মিজান দু-হাতে কফির মগ চেপে ধরে।

'আমাকে মনে না রাখলে তোমাকে খুঁজে বেড়ানোটা অর্থহীন হয়ে যেত আমার কাছে।'

'খুঁজে বেড়াচ্ছিস কেন?'

'একদিন আমার বাসায় এস। বল, কবে আসবে?'

'বাসাটা কোথায়? কত নাম্বার? কত তলা? সেটা না জেনে কি করে বলি?'

ব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বের করে মিজানের হাতে দিয়ে টুসি বলে, 'এটা আগে পকেটে রাখো।'

মিজান কার্ডটা নিয়ে চোখ বুলায়। ইস্কাটন, ইস্টার্ন টাওয়ার। বিড়বিড় করে বলে। তারপর সেটা পকেটে রেখে বলে, 'অফিসও আছে দেখছি! চাকরি না ব্যাবসা?'

'পরে জানতে পারবে!'

কফিতে চুমুক দিয়ে টুসি আবার বলল, 'দেশে ফিরেছি আজ দু বছর। তোমার গ্রামের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই? কেউ তোমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না!'

'আমার গ্রামের বাড়ি গেছিস নাকি? ঠিকানা পেলি কোথায়?'

'বুলবুলির কাছ থেকে।'

'বুলবুলি কি করছে এখন?'

'কেন? বুলবুলি তো এখন বাংলাদেশের টপ-সিঙ্গার! তুমি জানো না?'

'অনেক দিন ওর সাথে দেখা নেই!'

'ছবি দেখেও চিনতে পারোনি?'

'কি করে চিনব?'

'বুলি ওয়াহিদার নাম শোন নাই?'

'ও-ই কি বুলবুলি?'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল মিজান।

'তুমি তাহলে আছ কোথায়?'

টেবিলে চাপড় দিয়ে হেসে উঠে টুসি।

'তাই তো বলি, পোস্টারের চেহারাটা কেন এত চেনা চেনা মনে হয়!'

বুলি ওয়াহিদা যে মিজানের বেশ পছন্দের শিল্পীদের একজন তা আর বলল না।

টুসি বলল, 'বুলবুলিটা মনে হয় তোমাকে সবার চাইতে বেশি পছন্দ করতো! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এ নিয়ে আমাদের কক্ষণো কিছু বলেনি!'

'তোর এমনটা মনে হল কেন?'

'নয়তো এত বছর ধরে তোমার ঠিকানা সযত্নে রেখে দেবে কোন যুক্তিতে?'

'হয়তো ভেবে রেখেছিল, আমাকে ওর বিয়ের কার্ড পাঠাবে!'

'হয়তোবা!'

টুসি মাথা দোলায়।

তারপর আবার বলে, 'তবে, তোমার আগ্রহ দেখেনি বলেই হয়তো মনের জিনিস মনেই চেপে রেখেছে!'

মিজান বলল, 'এটাও অসম্ভব কিছু না।'

তারপর বলে, 'দেশে কি একবারেই চলে এসেছিস?'

'না। মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া আছে। সিটিজেনশিপটা তো রক্ষা করতে হবে!'

আগের কথার খেই ধরে টুসি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোই বললে না তো!'

কিছু বুঝতে না পেরে মিজান ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'কী বলব?'

'দেশের বাড়ির সাথে তোমার সম্পর্কের কথা!'

'নাহ! নেই।'

'ব্যাপারটা কি জানতে পারি?'

'আমার বিষয়ে তোর জেনে কাজ নেই। তুই কেন আমাকে খুঁজছিলি সেটা আগে বল?'

কফির মগ তুলে নিয়ে মাথা নাড়ে টুসি। সে অনেক কথা। বাসায় নয় তো অফিসে এস। তোমাকে স-ব বলব।'

টুসি এক চুমুক কফি গিলে বলল, 'তুমি এখন কি করছো? অমন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলে কোথায়?'

'বলতে গেলে তেমন কিছুই করছি না। আবার করছিও এমন।'

‘ঠিক বুঝলাম না।’

‘অন্যের কাছে বলার মত কিছু না।’

‘আহা, বলই-না!’

টুসি জেদ ধরে।

‘টিউশানি। পনেরটা টিউশানি করি। মাসে এভারেজ পনের হাজার আসে। একা মানুষের আর কত টাকা দরকার?’

টুসি হাসে। বলে, ‘ব্যাঙ্কে নিশ্চয়ই মোটা অ্যামাউন্ট জমেছে?’

মিজান হেসে বলল, ‘কেন? ধার চাইবি নাকি?’

‘চাইতেও পারি! আর কিছু চাইলে তো তোমার কাছেই চাইতে পারি! বল, মিথ্যে কিনা?’

‘অন্য কাউকেও এমন কথা আরো বলিস কিনা আমি কি করে বুঝব?’

টুসি চুপ করে থাকে। কফির মগটা বার কয়েক টেবিলের উপর ঘুরায়। কিছু একটা নিয়ে ভাবল মনে হয়।

তারপর মিজানের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘টিউশানি করে মজা পাও? চাকরি করতে ইচ্ছে হয় না?’

‘এখন সব কিছুই অভ্যেস হয়ে গেছে। ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারি না!’

‘বিয়ে করেছো?’

‘কে বিয়ে করবে আমাকে?’

‘কেন? মেয়ের আকাল পড়েছে নাকি দেশটায়?’

‘যার তিন কূলে কেউ নেই, এমন ছেলের কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে সাহস পায় না আজকাল।’

‘প্রেমও করতে পারলে না একটা!’

‘তোরা ছিলি তিন জন। নাজু, বুলবুলি আর তুই। কেউ কি পাত্তা দিলি আমাকে? না কোনোদিন নিজেদের স্বার্থ ছাড়া এক মিনিট বসেছিস আমার পাশে!’

কফিতে চুমুক দিয়ে টুসি বলল, ‘মিজান! আমাদের স্বার্থ যে ছিল না সেটা একবারেই অস্বীকার করব না! তবে, তুমি আসলে আমাদের তিনজনেরই পছন্দের মানুষ ছিলে! অবশ্য আমাদের মাঝে একটা বোঝা-পড়া ছিল!’

মিজান কৌতুহলি হয়ে উঠে। বলে, ‘বোঝা-পড়াটা কি ছিল?’

‘অ্যাদ্দিন পর জেনে আর কি হবে?’

‘আহা, বল না! জানতে খুব ইচ্ছে করছে!’

টুসি বলে, ‘তুমি প্রথম যাকে ভালবাসার কথা বলবে সেই তোমাকে পাবে। অন্যরা আস্তে-আস্তে সরে যাবে। কিন্তু শালার এমনই আমাদের ফাটা কপাল যে, মুখ ফুটে কথাটা কাউকে বলেছ, তাও কোনো দিন শুনতে পেলাম না!’

মিজান হেসে ঠান্ডা কফিতে কয়েকটা চুমুক দিয়ে মগটা রেখে দেয়।

সে সময় কি আমার সেই সুযোগ বা মন মানসিকতা থাকতে পারে? অভাবের বিরুদ্ধে লড়ব না তোদের কাছে প্রেমের পরীক্ষা দেব?’

টুসি বলল, ‘আচ্ছা, ওসব কথা থাক! এখন বল, আমাদের এই তিন জনের বাইরে আর কোনো মেয়ে ছিল কিনা?’

‘ছিল!’

‘তবে?’

‘অন্যদের বুঝতে পারি না!’

‘বুঝতে না পারলে কি কেউ অচেনা মেয়েদের বিয়ে করে না? আমাদের বাবা-মায়েরা কি একজন আরেক জনকে না দেখে বিয়ে করেন নি? তাঁদের কেউ কাউকেই কি বুঝতে পারেন নি?’

‘হয়তো পেরেছেন বলেই আমরা আজ এখানে। আর তাদের পথ ধরে আমিও তাঁদের মত হতে চেষ্টা করেছি! বিয়েও করেছিলাম!’

‘করেছিলাম মানে?’

টুসি বিস্মিত হয়ে বলল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিজান বলল, ‘আমার দরিদ্র্য!’

‘যেমন?’

অপার আগ্রহে টুসি চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সোজা হয়।

‘যেমন, আমার প্রাচুর্যের অভাব হয়ত দায়ী! বাড়ি-গাড়ি করতে পারিনি!’

‘একজন স্ত্রী কি শুধু এসবের জন্যেই স্ত্রী হবে?’

তা ছাড়া কী বা বলতে পারি!

টুসি বলল, ‘একজনই সব মেয়েদের মডেল হতে পারে না! তাহলে সে স্ত্রী ছিল না!’

‘কি ছিল?’

‘সে ছিল একটা মেয়ে মানুষ! আর সে কারণেই সংসারের চাইতে, শান্তি-ভালবাসার চাইতে তার কাছে বড়লোকি চালটাই বড় হয়ে উঠেছিল! তুমি আগে খোঁজ-খবর করে বিয়ে করোনি?’

'আমি নিজে নেইনি।'

'সে এখন কোথায়?'

'শুনেছি নিউজার্সিতে আছে।'

'আবার বিয়ে করেছে?'

'গ্রিনকার্ডঅলাকে বিয়ে করেছে বলেই তো সে ওখানে!'

টুসির মন খারাপ হয়ে যায়। বলে, 'সরি মিজান! তোমার মনটা খারাপ করে দিলাম! আসলে গাড়ি-বাড়ি-টাকা-পয়সা মানুষকে সুখ দিতে পারলে দুনিয়াতে এত অঘটন ঘটত না!'

'সেটা তুই আমি বুঝলে কি হবে? অন্যান্যরা না বুঝলে আমাদের কী করবার আছে?'

'আছে! অনেক কিছুই করবার আছে।'

'কি রকম? শুনি!'

'আগে আমাদের প্যাষ্ট হতে হবে। তা না হলে একাএকা আগানো যাবে না!'

'নাজুর কোনো খবর জানিস?'

'ও ঢাকাতেই কোথাও আছে। আমার সাথে আর দেখা হয়নি। বসিলার দিকে ওদের বাড়ি যাবার রাস্তাটা এখন ভুলে গেছি।'

মিজান বলল, 'আমিও। এলাকাটায় কিছুটা চেঞ্জ এসেছে। বাড়ির তো আর কোন নাম্বার ছিল না। স্মৃতি থেকে বেশি মনে করতে পারিনি।'

'প্রথমটায় আমিও ট্রাই করেছিলাম। কিন্তু বেশ কয়েকবার ওদিকে গিয়েও আমি দিশা ঠিক রাখতে পারি না। পশ্চিমে যাবার সময় মনে হয় উত্তর দিকে যাচ্ছি।'

মিজান ঘড়ি দেখে উঠে পড়ে। বলে, 'আমার সময় নেই। তোর গাড়ি দিয়ে আমাকে ধানমন্ডি নামিয়ে দিয়ে আয়।'

'আজ না গেলে চলে না?'

'আরে পাগল নাকি? ছাত্রটা কদিন বাদে টেস্ট পরীক্ষা দেবে!'

'ওসব ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে নেমে যাও!'

'ভেবে দেখি!'

টুসি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলো। বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়।

ধানমন্ডি নামবার আগে মিজানকে কথা দিতে হয় যে, শুক্রবারে সে অবশ্যই টুসির বাসায় যাচ্ছে।

তারপর সে গলি দিয়ে হেঁটে টনিদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বেল বাজায়।

আজও দরজা খোলে টনির খালা নিনি। কিন্তু সে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় না বা ভেতরের দিকে চলে যায় না। মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এই মুহূর্তটায় বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যায় মিজান। বলে, 'ভেতরে যেতে দেবেন না নাকি? কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?'

নিনি বলে, 'এই আপনার আসবার সময় হল? ক'টা বাজে জানেন?'

মিজান বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার হাতে ঘড়ি নেই!'

নিনি বলে, 'আধা ঘন্টা লেট।'

মনেমনে মিজান রেগে উঠে। বলে, 'ঘন্টা ধরে তো পড়াবার কথা ছিল না! আচ্ছা চলি!'

মিজান পেছন ফিরে যেতে উদ্যত হয়।

নিনি তার একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'পি-জ! যাবেন না!'

মিজান ইচ্ছে করলেই এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারতো। কিন্তু সে তা করল না। বলল, 'মানুষকে জ্বালাতন করা কি আপনার স্বভাব? রোজই তো এমন করছেন? আমার যে এমনটা পছন্দ না তা বুঝতে পারেন না আপনি?'

'ভেতরে আসুন!' বলে, মিজানকে টেনে নেয় নিনি।

তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, 'কিছু মনে করবেন না! ভেবেছিলাম আপনিও বুঝি মেরুদন্ডহীন!'

'কেন? এমনটা ভাববেন কেন আপনি?'

'যারা টিউশানি করে, তারা বেশির ভাগই এমন!'

মিজানের জেদ চেপে যায়। বলে, 'এটা আপনার বাড়াবাড়ি!'

নিনি বলল, 'আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন?'

'রাগ হবে না কেন? টিউশানি কারা করে আপনি জানেন? জানা না থাকলে আপনার জানা উচিত যে, লেখা-পড়ায় গাধা আর মাথা ভর্তি যাদের গোবর তাদের কেউ টিউশানি করে না!'

সে কথার ধারে কাছে না গিয়ে আচমকা নিনি বলল, 'আমি টনিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি!'

নিনি তর্কের মাঝ পথে পালিয়ে যাওয়াতে হতাশ হয়ে একটা সোফায় ধপ করে বসে পড়ে মিজান।

কিছুক্ষণ পর কাজের ছেলের হাতে ট্রেতে করে চা বিস্কিট নিয়ে এলেন

টনির মা তিন্নি। বললেন, 'পাজি মেয়েটা আপনার দেরি করিয়ে দিল বলে মন খারাপ করবেন না! ও এমনই! কাউকে রাগিয়ে দিতে পারলে মজা পায় খুব!'

মিজান বলল, 'মন খারাপ অবশ্যই করব! আপনাদের জানা উচিত নিনির ওটা মানসিক রোগ! ডাক্তার না দেখালে খুব শিঘ্রিই বিপদে পড়ে যাবেন!'

তিন্নির মুখটা কাল হয়ে গেল। ট্রে থেকে কাপ পিরিচ ফল আর তিন পদের বিস্কিটের বাটি নামিয়ে রাখলেন। তারপর কাজের ছেলেটাকে বললেন, 'তুই যা! টনিকে বল, ওকে আজ পড়তে হবে না!'

মিজান অবাক হয়ে বলল, 'টনি আজ পড়বে না?'

'তাই তো বলল!'

'হঠাৎ পড়তে চাচ্ছে না, কেমন কথা?'

তিন্নি সলজ্জ ভাবে হেসে বললেন, 'ওর ডায়রিয়া শুরু হয়েছে দুপুরের পর। একটু পরপর টয়লেটে যেতে হয় বলে লজ্জা পাচ্ছে খুব!'

'কি ওষুধ দিলেন? স্যালাইন খাচ্ছে তো?'

'খাচ্ছে!'

তিনি আবার বললেন, 'আরেকটা কথা! টনির এই ব্যাপারটা আপনাকে জানাতে মানা করেছিল! কিন্তু আমিই ভুল করে বলে দিয়েছি!'

'ও এই কথা! ঠিক আছে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি!'

মনটা আবার ভাল হয়ে যেতেই মিজান চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয়।

তিন্নি কিছুক্ষণ চুপ করে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'মিজান! আপনি নিনির ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছেন। ও আসলে মানসিক রোগী। দিন কয়েক এসেছে আমাদের এখানে। এতদিন ইটালিতে ছিল। মানসিক হাসপাতালেও ছিল কিছুদিন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন না হওয়াতে ওর হাজবেন্ড ওকে এখানে রেখে গেছে!'

'আপনারা কিছু বললেন না?'

'কি বলব! কেউ কি তার পাগল বউকে কাছে রেখে নিজের বিপদ ডেকে আনবে? তবুও তো আমি মনে করি টুটুল মানে নিনির হাজবেন্ডের মত লোক হয় না! অনেক চেষ্টা করেছে বেচারা! একবছর চিকিৎসা চালিয়েছে! আমাদের কিছু জানায়নি! যখন আর পারল না তখনই এখানে রেখে গেছে! বলেছে চিকিৎসা করাতে! যত টাকা লাগে দেবে!'

মিজান চা খাওয়া শেষ করে বলল, 'ইটালির মত দেশেই যখন কিছু

হল না, তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই জটিল! এখানে আর কাউকে দেখিয়েছেন?'

'কাকে দেখাব সেটাই তো ভাবছি!'

তিন্নি মিজানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তিন্নির উদগ্রীব চেহারা দেখে কিছুক্ষণ ভাবল মিজান।

তারপর বলল, 'একটা কাজ করতে পারেন। আর সেটা হল পুরান ঢাকায় মানে আরমানিটোলা একজন সাইকিয়াট্রিস আছেন। লোকে তাঁকে পাগলা ডাক্তার বলে। ভাল নাম একটা আছে। কিন্তু মনে পড়ছে না।'

মিজান তার মাথার ডান দিকে তর্জনি দিয়ে আস্তেআস্তে টোকা দিতে লাগল।

তিন্নি বললেন, 'সেই ডাক্তার কি পারবে বলে আপনি মনে করেন?'

'হ্যাঁ। তাঁর নাম ইস্রাফিল মলি-ক। তাঁর চিকিৎসার মাধ্যম হচ্ছে হিপনোটিজম আর যোগ সাধনা। ওখানে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন! তবে আগে একবার আলাপ করে নিলে ভাল করবেন!'

তিন্নি সাগ্রহে কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'তাহলে একদিন আসেন না আমার সাথে! সময় হবে আপনার?'

'সময় বের করে নিতে হবে! হয়তো কোনো একটা শুক্রবারে চেষ্টা করতে হবে!'

'প-্যানটা কিভাবে করবেন আপনি?'

মিজান বলল, 'আমি আগে নিজে কথা বলব! ডাক্তার সাহেব যদি রোগী দেখতে চান তাহলে আপনাদের নিয়ে যাওয়া যাবে!'

'তাহলে একটু হেল্প করেন না! পি-জ!'

'ঠিক আছে! আজ যাই। আগামী দিন দেখি কোনো ধরনের খবর নিতে পারি কিনা!'

মিজান উঠবার সময় দেখতে পেল নিনি এদিকেই আসছে। সে মনেমনে ভাবল, কি অদ্ভুত মানুষের জীবন! এত সুন্দর একটা মেয়ে, যে কিনা নিজেই জানে না সে পাগল! আর তখনই নিনির জন্যে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। মনেমনে ঠিক করল আজ আর কোনো টিউশানি নয়।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে ঢুকল।

তারপর পকেট থেকে তিনজনের নাম্বারে ফোন করে জানিয়ে দিল আজ সে আসতে পারবে না। আগামী দিন না আসতে পারলেও ফোন করে জানিয়ে দেবে।

দোকান থেকে বেরিয়েই সে একটা বেবি-ট্যাক্সিঅলাকে ডাকে।

'আরমানিটোলা কত নিবা?'

'আরমানিটোলা যাইবেন? রাস্তায় হেবি জাম অইবো সাব! দেরি হইবো!'

'আমার অসুবিধা নাই!'

'ভাড়া তাইলে দেড়'শ ট্যাকা দিয়েন।'

'কি কও মিয়া? এই ট্যাকায় ট্যাক্সি-ক্যাব পাওয়া যায়!'

লোকটা হাসে। 'কোনো ক্যাব যাইবো না!'

'তাই চান্স লইলা?'

'না সাব! বেশি চাই নাই! আপনে জিগাইয়া দ্যাহেন, অন্যরা আরো বেশি চাইবো!'

মিজান কোনো কথা না বলে একটা নয় নাম্বার বাসে উঠে পড়ে। এই বাসে গুলিস্তান গিয়ে রিকশায় আরমানিটোলা। সময় তেমন লাগল না। সন্ধ্যার আগে আগেই সে আরমানিটোলা পৌঁছে যায়। আশ-পাশের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই ডাক্তারের হদিস পেয়ে গেল।

একটা সরুগলি পথে সে এগিয়ে যায়।

ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ঢুকতেই দেখল বেজায় ভিড়। অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন নারী-পুরুষ আছে। সে বসতেই সেখানকার একজন তার হাতে একটা প-াস্টিকের টোকেন ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'টোকেন ছাড়া কথা কইতে পারবেন না। ভিজিট দিছেন?'

'না তো!'

তার পাশেই একটা মেয়ে কাউন্টারের ভেতর বসে আছে। সে ভাবল। কি আশ্চর্য! এটা আমার চোখেই পড়ল না! সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি!'

কাউন্টারের মেয়েটা বলল, 'জি বলুন!'

'ডাক্তারের ফি কত বলবেন কি?'

'অবশ্যই। তার আগে আপনাকে বলতে হবে এই প্রথমবার এসেছেন কিনা। কারো রেফারেন্সে এলে তার নাম। রোগী দেখাবেন, না রোগীর বিবরণ জানাবেন?'

মেয়েটা একটা খাতা উল্টে খালি পৃষ্ঠায় নাম্বার আর তারিখ লিখে আবার বলল, 'বলুন। আগে রোগীর নাম আর বয়স।'

মিজান মুশকিলে পড়ে গেল। বয়স তো সে বলতে পারবে না। জিজ্ঞেস করল, 'আনুমানিক বয়স হলে চলবে?'

'চলবে।'

'নাম লিখুন নিনি। বয়স আনুমানিক সাতাশ বা আঠাশ। কারো রেফারেন্সে আসিনি। রোগীর বিবরণ জানাতে এসেছি।'

'দুশো টাকা দিন।'

মিজানের কাছে এত টাকা থাকবার কথা না। নিরাপত্তার জন্যে ওয়ালেটের ভেতর এক কোণায় একটা পাঁচ'শ টাকার নোট রেখে দেয় সব সময়। সেই টাকা বের করে মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিল।

তারপর তিন'শ টাকা আর একটা কার্ড ফেরত নিয়ে সে সোফায় বসে অপেক্ষা করে।

লোকজন তেমন দেরি করছে না। খুব কম সময়েই তার সিরিয়াল চলে এল। ডাক পড়তে সে উঠে এগিয়ে যায়। সালাম দিয়ে ডাক্তারের সামনে বসতেই ডাক্তার সাহেব বললেন, 'বলুন কি প্রোবলেম!'

ডাক্তার সাহেবের বয়স কম করে হলেও সত্তুর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু শরীরটা বেশ মজবুত। সে অনুমান করে যে, ব্যায়ামের কারণেই বোধ হয় স্বাস্থ্যটা এমন আছে। বলল, 'রোগী আগে ইটালিতে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। দেখলে কেউ বুঝবে না যে মেয়েটা পাগল।'

মিজানের কথার মাঝ পথেই ডাক্তার বললেন, 'আহ-হা! পাগল না, পাগল না! মানসিক রোগী বলেন! রাস্তা-ঘাটে যারা ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায় ওরা হচ্ছে পাগল!'

মিজান আবার বলে, 'এম্নিতে স্বাভাবিক। কেবল মানুষকে রাগানোর জন্যে নানা রকম ঝামেলা পাকায়।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি পেপার্স আনেননি। রেফারেন্স ছাড়াই এসেছেন দেখছি! কি করে পেলেন আমাকে?'

'আপনি তো অনেক বছর ধরেই এখানে আছেন। আমিও বেশ কিছুদিন এই এলাকায় ছিলাম। তখনই আপনার কথা শুনি। আপনার চিকিৎসা পদ্ধতিটাই আমাকে আগ্রহি করে তোলে।'

'আপনি কাল সকালের দিকে বেলা এগারোটার আগেই পেশেন্টকে নিয়ে আসুন! এ সময় আমি কাউকে দেখি না! তবুও আপনার পেশেন্টকে নিয়ে আসুন! আগের ট্রিটমেন্টের যত রকম রিপোর্ট পাওয়া যায় সবই আনতে চেষ্টা করবেন!'

মিজান বলল, 'ঠিক আছে! আমি আগামী কাল আসবার আগে আপনাকে একটা ফোন দেব!'

'তাহলে বেশ ভাল হবে!'

'আসি তাহলে!'

ডাক্তার মুখে কিছু না বলে কেবল ডান হাতটা একবার উপরে তুললেন।

মিজান ঠিক করল রাতে একবার তিন্নির সাথে কথা বলতে হবে।

পাগলা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে মিজান একটা রিকশায় উঠে বসল। পুরোনো ঢাকার সেই জৌলুস এখন আর নেই। নেই সেই বনেদি ছাপ। ঢাকা সরতে সরতে একদিন জয়দেবপুর পেরিয়ে যাবে। শুধু পড়ে থাকবে আদি ঢাকার মুমূর্ষু একটা কংকাল।

আরমানিটোলা থেকে ফিরতে কিছুটা রাত হয়ে গিয়েছিল।

মেসের অন্যান্য বোর্ডাররা কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। নয়তো এ সময়টায় মোটামুটি সরগরম থাকে রুমগুলো। মিজান একাই একটা রুম নিয়ে থাকে। অন্য কারু সঙ্গে থাকলে অনেক সময় দেখা যায় রুমমেটের ইচ্ছা অনিচ্ছাকেও গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না। এমনটা সে হোস্টেলে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল।

রুমের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতেই কেমন একটা গন্ধ নাকে এল। তাই ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে কাপড় পাল্টায়। বাথরুমে গিয়ে ফ্রি-স্টাইল গোসল সেরে একটু রেস্ট নেবার জন্যে সে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকে চোখ বন্ধ করে। ভাবে, নিনির ব্যাপারটা রাতেই তিন্নির সাথে আলাপ করে রাখবে নাকি পড়াতে গিয়ে জানালেও চলবে।

রোগী-ডাক্তারের ব্যাপার বলে কথা। সে এখনই ফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবে। তাই সে আবার সার্টটা গায়ে চড়িয়ে লুঙ্গি পড়া অবস্থাতেই রাস্তার ওপার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে গিয়ে ফোন করবে বলে ঠিক করে। মেসের গেট পেরোতেই আধো অন্ধকার থেকে একটা ডাক ভেসে আসে, 'এই যে ভাই! শোনেন তো!'

মিজান বক্তার উদ্দেশ্যে ফিরে তাকায়। প্রথমটায় কাউকেই দেখতে না পেয়ে সে চলে যেতে উদ্যত হলে লোকটা এগিয়ে আসে। মিজান ভাবল, এই ছোকরা আবার কেন ডাকে?

ছোকরা কাছে এগিয়ে আসে।

মিজান জিজ্ঞেস করে, কেন ডাকছিলে?

হালকা পাতলা শরীরের ছেলেটাকে দেখে কিছুতেই সতের বছর বয়সের বেশি মনে করা যায় না। তার ধারণা পাশের বস্তির কেউ হবে হয়ত।

কিন্তু সে ভেবে পেল না তার কাছে এই ছেলের কী এমন কাজ থাকতে পারে!

ছেলেটা প্যান্টের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে মাথার চুল ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'আমারে আপনে চিনেন না?'

মিজান অবাক হয়ে বলে, 'তোমাকে চিনব কিভাবে? এর আগে তো কোনো দিন দেখিনি!'

'আমার নাম হারুন। টিক্কা হারুন। কয়দিন আগে আপনের লগে আমার কথা হইছিল।'

'কোন বিষয়ে?'

মিজান আরো আশ্চর্য হয়ে যায়।

'আপনেরে কই নাই পরতেক মাসে পাশ-শ কইরা ট্যাকা দিতে হইবো? কইছিলেন পরে দ্যাখা করনের লাইগা।'

মিজানের মনে পড়ে। আট-দশ দিন আগে আরো কয়েকজন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে এই ছেলেই টাকা দাবী করেছিল। টিউশানিতে যাবার তাড়া ছিল বলে মিজান বলেছিল পরে দেখা যাবে। তার অর্থ এই নয় যে, টাকা দেবার কথা সে স্বীকার করেছে। মনে মনে রেগে উঠলেও সে তা প্রকাশ করে না। স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, 'কিন্তু কেন টাকা দেব সেটা তো বলনি!'

'আমাগ মহল-য় মেস ভাড়া কইরা থাকেন। আমরা ব্যাকার পোলাপান। আমাগও তো খর্চ-পাতি আছে নাকি? আপনেরা না দিলে আমরা চলুম ক্যামনে?'

মিজান বলল, 'আমি কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না। তুমি যাও। আমার কাজ আছে।'

ছেলেটা নড়ে না। বলে, 'আপনে হুনছি দশ-পনেরটা টিউশানি করেন। মাসে কামাইও করেন ম্যালা! একলা একটা রোম নিয়া থাকেন। তার লাইগা আপনে মাসে আমাগোরে দিবেন পাশ-শ ট্যাকা!'

মিজান যেন আকাশ থেকে পড়ে। ছোকরা বলে কি?

সে এতদিন শুনেছে ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে এরা চাঁদা তোলে। এখন এরা ঘরে-ঘরে এসে চাঁদাবাজি আরম্ভ করে দিয়েছে? দেশটা কি একেবারেই পচে গেল?

'কি ভাই, আমার কথা কানে গেল? আপনেগ সব বোর্ডার মাসে পঞ্চাশ ট্যাকা কইরা দেয়। আপনেও রেহাই পাইবেন না!'

মিজান বলল, 'আমি কোনো চান্দা-ফান্দা দেব না!'

'তাইলে আপনে এই এলাকায় থাকতেও পারবেন না!'

মিজান আর নিজকে সামলাতে পারল না। রেগে উঠে বলল, 'এটা কি তোদের বাপের জমিদারি? এসে বলবি টাকা দাও আর অমনিই দিয়ে দেব?'

'কইলাম তো!'

ছেলেটা রেগে উঠে না। শান্ত ভাবেই বলে, 'আপনে হুদা হুদি মুখ খারাপ কইরেন না কইয়া দিতাছি! চান্দা না দিয়া আমার এরিয়ায় থাকতে পারবেন না!'

'কি করবি তুই? মেরে ফেলবি?'

'হেইডা পরে দ্যাহা যাইবো!'

মিজানের গলার শব্দে কয়েকজন তার পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, 'কি ভাই কি অইছে?'

একজন হারুনকে চিনতে পেরে বলল, 'কি হারুন ভাই! ভাল আছেন?'

হারুন মিজানের মুখ বরাবর আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল, 'আমার নাম টিক্কা হারচন। কয়দিন পরে আবার আমু। হেইদিন ফিরা গেলে খুব বেশি ভালা হইবো না কইয়া দিলাম!'

মিজানের রাগ একটুও কমেনি। সে রেগেই বলল, 'যা যা! একটা সিকিও পাবি না! কি করতে পারবি?'

'সময় হইলেই দ্যাখামু!'

'যা! তুই যা দেখাতে পারিস দেখাস! ব্যাটারা মগের মল-ুক পেয়েছিস যে, যা ইচ্ছা তাই করবি!'

'আবার দ্যাখা হইবো! খোদা হাফেজ!' বলে, পাশে রাখা মটরসাইকেলে উঠে তুমুল শব্দে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে চলে গেল টিক্কা হারুন।

রাস্তার লোকজন কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ভাই, আপনি কাজটা ভাল করলেন না। এরা লোক ভাল না। তাছাড়া এদের বাপ-মায়ের ঠিক নেই। আর বাপ মা ঠিক থাকলেও দেখা যায় মা-বাপগুলো হাই ক্লাসের খানকি আর চোট্টা! নষ্ট রক্তে জন্ম! আপনি এদের সাথে পারবেন না!'

মিজান বলল, 'দেশে কি আইন নেই?'

একজন বলল, 'আইন আছে। তবে শুনেছি এখানকার থানার ওসি, ওয়ার্ড-কমিশনার এমন কি মন্ত্রী-মিনিস্টারের সাথেও নাকি টিক্কা হারুনের হট কানেকশান। সেই হিসাবে আমরা ছারপোকা ছাড়া আর কিছু না।'

'থানায় গিয়ে ওর নামে কেস করব!'

একজন বুড়ো মতন লোক এগিয়ে এসে বললেন, 'কেস করবেন ঠিক

আছে। আপনি তো কোনো সাক্ষী পাবেন না। সাক্ষী দিয়ে নিজেকে কেউ বিপদে ফেলবে না। উল্টো আপনারই হেনস্থা হবে।'

মিজান আর ফোন করতে যায় না। মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ভাবে, কি দেশে বাস করছি! কোনো আইন-কানুন নেই। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই! মানুষের মনুষত্ব নেই! তাহলে কি আমরা সবাই প্রাসাদ-অরণ্যে জানোয়ার হয়ে যাচ্ছি!

সে পাশের রেষ্টুরেন্টে ঢুকে চা-পুড়ি খায়। তারপর রুমে এসে আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না। এই বিল্ডিঙের সব বোর্ডার মাস্ত নদের নিয়মিত চাঁদা দেয়! কেন দেবে? যদি না দিত, সবাই জোট বেঁধে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই তো আর অন্য কেউ চাঁদাবাজি করতে সাহস পেত না। আমরা আসলে দিনদিন বড্ড আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি। পারস্পরিক সহমর্মিতা আর সহযোগিতার মানসিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশ!

কিছুক্ষণ পর তার বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা পড়ে। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে যায়। বাড়িওয়ালা হারু চৌধুরী হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মিজানের কাছে ভদ্র লোকের হাসিটাকে কান্নার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হল। সে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম! হঠাৎ কি মনে করে?'

'একটু ভেতরে আসব? কথা ছিল!'

মিজান সরে গিয়ে ভদ্রলোককে জায়গা করে দেয়।

ঘরের ভেতরে ঢুকে তিনি নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর কোথায় বসবেন তেমন কোনো জায়গা না পেয়ে মিজানের বিছানাতেই বসে পড়লেন।

মিজান দেখল লোকটার চেহারা কেমন করুণ হয়ে আছে। হয়ত তাড়াহুড়োর কারণে পাঞ্জাবিটা উল্টো করে গায়ে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলেন?'

'বাবা, আমি বুড়ো মানুষ! ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যেতে ভয় পাই! তা ছাড়া এই বাড়িটাই আমার সম্বল!' বলে, বৃদ্ধ থামলেন। মনে মনে হয়ত কি বলবেন সে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন।

মিজান জানে, এই বুড়ো মোটেও সত্য বলছেন না। তার আট থেকে দশটা বাড়ি এই ঢাকা শহরে। একাত্তরে দখল করেছেন অন্ততঃ সাতটা বাড়ি। তারপর দলিল জাল করে বাকিগুলো হাতিয়েছেন। বস্তির ছিঁচকে মাস্তান থেকে শুরু করে মন্ত্রী-মিনিস্টার পর্যন্ত তার যোগাযোগ।

‘বাবা!’ বুড়ো মুখ তুললেন। ‘আমি বুড়ো মানুষ! গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। আপনি আমার ছেলের বয়েসী। আপনাকে বাবা কথাটা না বলে আর পারছি না!’

‘কি কথা?’

‘এই যে, পাড়ার গুন্ডা-পান্ডা ছেলেগুলো খুবই ডেয়ারিং। ওদের সাথে লেগে টিকতে পারবেন না। ওদের কথা না শুনলে আপনার আমার সবারই ক্ষতি হবে। দেখা যাবে কখন কোথায় বোমা ফাটিয়ে আপনাকে দিয়েছে পঙ্গু করে। আর আমার উপর নেমে আসবে নানাবিধ অত্যাচার। তো বাবা! বলছিলাম কি, আপনার যখন এদের সাথে গন্ডগোল হয়েই গেছে, আপনি বরং এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান। বলা তো যায় না বিপদ কোন দিক দিয়ে আসে!’

মিজান বলল, ‘আপনিও এই কথাই বললেন? ওদের কী অধিকার আছে আপনার আমার টাকায়? কেন দিতে হবে টাকা? কখনো জিজ্ঞেস করে দেখেছেন? এই আপনাদের মত কিছু মেরুদন্ডহীন মানুষের জন্যেই আমাদের সুন্দর সমাজটা দিনকে দিন পচে যাচ্ছে!’

বৃদ্ধ রাগলেন না। বললেন, ‘বাবা! এখন আপনার গরম বয়েস। আমরাও এককালে গরম ছিলাম। যুদ্ধ করেছি এ দেশে। কিন্তু কী পেয়েছি আমরা? সেই তো নিজের দেশেই শত্রুদের সাথে আপস করে থাকছি। প্রতিকার কোথাও পাবেন না। আপনার খুঁটির জোর না থাকলে এভাবে ব্যয় দিয়ে সারাটা জীবন বাঁচতে হবে।’

‘তাহলে কি...!’

‘থামেন! থামেন বাবা! কি বলবেন বুঝতে পারছি! আপনি লড়াই করবেন? আপনার বন্ধুই বলবে কি দরকার খামোখা হুজ্জত করে? পড়শীরা বলবে কোনো ঝামেলা পাকাবেন না। আপনাকেই পরে দায়ী করবে। বলবে এতদিন ভালই ছিলাম, কেবল আপনার জন্যেই আমাদের শান্তিটা গেল!’

মিজান বুঝতে পারছিল যে, এরই মধ্যে টিক্কা হারুনদের সঙ্গে বৃদ্ধের কথা হয়েছে। ফোনে হুমকি ধমকি দিয়েছে হয়ত। আর সে জন্যেই তিনি ছুটে এসেছেন। যার পরিণতি হিসেবে তাকে এ এলাকা ছেড়ে দিতে হবে।

সে বৃদ্ধকে বলল, ‘তো আমাকে কবে রুমটা ছাড়তে হবে?’

বৃদ্ধর মুখটা কেমন কাল হয়ে গেল। বললেন, ‘ছেড়ে দেবেন? এতদিন ধরে আছেন! খারাপ লাগবে! তা বাবা! কোনো ভাবে ওদের সঙ্গে আপস করে ফেলা যায় না!’

মিজানের মেজাজ বিগড়ে যেতে থাকে। তবু নিজকে সে সামলে নেয়। বলে, ‘ওই আস্তাকুড়ের মানুষগুলোর সাথে আমার কোনো আপস নেই। দরকার হলে থাকব না এই এলাকায়। কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়ব। ওরা কোত্থেকে এত সাহস পায়! কে দিচ্ছে ওদের এত ক্ষমতা?’

‘বাবা! আপনি রেগে যাচ্ছেন!’

মিজান বলল, ‘ঠিক আছে! আমি আপনার রুম দুএক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দিচ্ছি। কালই আপনাকে জানিয়ে দেব!’

বৃদ্ধ উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘যাই! তবে আমার কথাটা একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন!’

মিজান কিছু না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় এসে বসে। মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। সে উঠে বোতল থেকে পানি খায়। ভাবে, এখানে তাহলে থাকা যাবে না! তার ইচ্ছে হয় একটা পিস্তল যোগাড় করে এক্ষুনি টিক্কা হারুনের মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা কেবলই ইচ্ছে বলেই রক্ষা! কেননা, সে কিভাবে পিস্তল যোগাড় করবে? কোথায় এসব পাওয়া যায়, কারা এসব বিক্রি করে সে খবর কে তাকে দেবে? তা ছাড়া এই সমস্ত হারুনদের আস্তানা কোথায়, সে কিভাবেই বা হদিস করবে? যদি আরেক মাস্তানের সাহায্য নেয়, তাও তো সেই সন্ত্রাসের কাছেই মাথা নোয়ানো হল!

সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। তার হঠাৎ করেই মনে পড়ে সোহেলের কথা! শুনেছিল সোহেল এখন মস্ত বড় ব্যাবসায়ী। একপয়সাও চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। কিন্তু কী করে সম্ভব? সে ভেবে পায় না। সে মনে মনে ভাবে যে, সোহেলের ঠিকানা খুঁজে বের করতেই হবে।

রাতে ভাল ঘুম হল না তার। যাও শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়েছিল , তাও আবার ভোর ছ'টায়ই ঘুমটা ভেঙে গেল। সে উঠে পানি খেয়ে পেছনের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে ঢাকা শহরটার অনেক কিছুই দেখা যায় না। সামনেই সুউচ্চ বিল্ডিং। সারাদিনে রোদের দেখা পাওয়া যাবে না। আকাশটাও একটু দেখা যায় না এখানে দাঁড়ালে। সে ভাবে, মানুষ দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সারাদিনেও এক টুকরো আকাশ দেখতে পাবে না। সূর্যের দেখা পাবে না। রাতের বেলা দেখা যাবে না চাঁদও। তাহলে আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে এভাবেই একদিন প্রকৃতি হারিয়ে যাবে?

তার হঠাৎ মনে পড়ে, নিনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কথাটা সে তিন্নিকে জানিয়েছিল কি না। কিন্তু সে কথাটা মনে করতে পারল

না।

সে ঘরে এসে টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে ঢোকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকায়। দুদিনের না কামানো দাড়িতে কেমন আঁতেল আঁতেল দেখাচ্ছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ভর্তি গালে একবার হাত বুলিয়ে সে ঠিক করল আজ আর শেভ করবে না। এখন বেরিয়েই সে হোটেলে নাস্ত া করবে। তারপর সোজা টনিদের বাড়ি।

মিজান তার দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরোতেই মনের ভেতর এক ধরনের ভয় কাজ করতে থাকে। বলা তো যায় না, কোন দিক থেকে টিক্কাদের দল গুলি নয়ত বোমা ছুঁড়ে দেবে! সে চারদিকে সাবধানি চোখে তাকায়। সন্দেহ-জনক কাউকেই চোখে পড়ল না। রেস্টুরেন্টে ঢুকে নাস্তার অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

এমন সময় রেস্টুরেন্টের সামনে একটা মোটরসাইকেল এসে থামল। ওটায় দুজন লোক বসে আছে। তারা আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে মটর সাইকেল থেকে নামে। একজন এগিয়ে গিয়ে পান দোকানের সামনে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। আর অন্যজন রেস্টুরেন্টের ক্যাশকাউন্টারে এসে দাঁড়ায়।

টেবিলে নাস্তা দিতেই মিজান খাওয়া শুরু করে। কিন্তু কান রাখে কাউন্টারের দিকে। কারণ লোকটাকে কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। লোকটা একটু ঝুঁকে ক্যাশিয়ার জয়নালকে আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'কাইলকা এহানে টিক্কার লগে কার গন্ডগোল হইছে কইতে পারস?'

জয়নাল বলল, 'গন্ডগোল? কোন সময় মিয়া বাই?'

লোকটার চেহারায় হতাশা ফুটে উঠল। বলল, 'ধুরো মিয়া!'

তারপর সে মিজানের সামনেই একটা চেয়ার টেনে বসে।

মিজান ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেও বাইরের দিকে চেহারায় কোনো পরিবর্তন হতে দিল না। খাওয়া শেষ করে বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'ফেরদৌস! এক কাপ চা দে!'

তারপর পানি খেয়ে রুমালে মুখ মুছে একটা কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁকগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাবারের কণা পরিষ্কার করতে থাকে।

ফেরদৌস টেবিলে চা নামিয়ে রেখে বলল, 'মিজান বাই! চা নেন!'

মিজানের সামনের লোকটার মাঝে কোনো রকম পরিবর্তন দেখা গেল না।

চা খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসে মিজান।

তারপর একটা রিকশায় চড়ে বলে, 'ধানমন্ডি।'

রিকশাঅলা বলল, 'রাস্তা বন্ধ কইরা দিছে। অনেক ঘুইরা যাইতে অইবো!'

'মানে?' মিজান বিস্মিত হয়ে বলে।

'হ সার!'

'আরে কালই তো ফার্মগেট দিয়ে গেলাম!'

'সকালতে বন্ধ! পান্ত-পত ও বন্ধ কইরা দিছে!'

'তাহলে কোন দিকে দিয়ে যাবে?'

'আপনে কইলে মালিবাগ-পল্টন অইয়া ইলিফেন রোড-সাইন্সলেবুটরি অইয়া যাইতে পারি!'

'তাহলে তোমাকে ভাড়া দিতে হবে কত?'

'দিয়েন আপনের ইনসাপ মতন!'

'পরে কিন্তু কম হইছে বইলা হাউ-কাউ করতে পারবা না!'

রিকশাঅলা মাথা নেড়ে রিকশায় উঠলো।

তারপর প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিকশাটা চালাতে আরম্ভ করে বলল, 'আমাগরে আর বাঁচতে দিবো না সার!'

মিজান প্রথমে খেয়াল না করলেও পরের দুটো কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'বুঝলাম না!'

'যেই সরকার ক্ষমতায় আইয়ে হেই সরকারই খালি রিকশাঅলাগোরেই চাপে। আইজ এই রাস্তা বন্ধ করে, কাইল বন্ধ করে হেইডা! এমন করলে তো দ্যাহা যায় আমরা মহল-ার রাস্তা ছাড়া রিকশা চালাইতে পারমু না!'

মিজান আলাপে উৎসাহ বোধ করে না। সে ভাবছিল লোকগুলো কারা? কার লোক? টিক্কা হারুনের নয় তো!

ভাবতে ভাবতে রিকশা কলাবাগান বাস স্ট্যান্ডে এসে পড়ে। রিকশাঅলার কথায় তার ঘোর কাটে। 'কোন দিকে যামু সার?'

'ডান দিকে!' বলে, মিজান হাত বাড়িয়ে পথ দেখায়।

টনিদের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে মিজান বলল, 'কত দিতে হবে?'

রিকশাঅলা বিনয়ী হাসি হেসে বলল, 'কইলাম না আপনের ইনসাপ!'

মিজান পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে ত্রিশ টাকা বাড়িয়ে ধরে।

রিকশঅলা চুপচাপ টাকাটা নিয়ে পকেটে পোরে।

তারপর সালাম দিয়ে রিকশা নিয়ে চলে যায়।

মিজান দরজার বেল টিপতেই কাজের বুয়া এসে দরজা খোলে। বুয়া অসময়ে মিজানকে দেখে বলল, 'সার! আপনে?'

'কেন? বাড়িতে কেউ নাই নাকি?'

'না! সবতেই আছে! আপনে বসেন, আমি অক্ষনই খবর দিতাছি!'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বুয়া দৌঁড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।

মিজান সোফায় বসে অপেক্ষা করে।

কিছুক্ষণ পরই তিন্নি আর নিনিকে দেখা যায় সিঁড়িতে।

মিজান তাদের দেখে বলে, 'ভাল আছেন? টনির কি খবর?'

তিন্নি বললেন, 'ভাল।'

তারপর তিনি এসে পাশের সোফায় বসে বললেন, 'আপনার মিশনের কি খবর? কিছু জানতে পেরেছেন?'

'পেরেছি!'

তিন্নি আগ্রহ ভরে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কি জানলেন?'

'আরমানিটোলায় ডাক্তারের চেম্বার। পুরোনো প্রেসক্রিপশান আর রিপোর্ট যা যা আছে সবই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কখন যেতে বলেছেন?'

'ডাক্তার আমাকে বলে দিয়েছেন এগারোটার দিকে যেতে। এখন আপনারা কি করবেন সেটা আপনাদেরই ঠিক করতে হবে।'

নিনি বলল, 'আমিও যাব! আমাকেও নেবে তো!'

মিজানকে বিস্মিত করে দিয়ে তিন্নি চোখ টিপলেন একবার।

তারপর নিনিকে বললেন, 'তুই কি করবি ডাক্তারের কাছে গিয়ে?'

'আমার চেকআপ করাবো!'

'তুই তো ভালই আছিস!'

'ভাল থাকলেও টুটুল আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতো।'

'সেখানে গেলে তোর সব মেডিকেল পেপারস সঙ্গে নিতে হবে।'

নিনি সানন্দেই রাজি হল। বলল, 'আমার পেপারস সব সময়ই রেডি থাকে। এখন আনব?'

'না। এখনই না। গোসল-টোসল করে রেডি হয়ে নে। কিন্তু পুরোনো ঢাকায় যেই গলি-ঘুঁজি! গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে?'

তিন্নি মিজানের দিকে তাকালেন।

'গাড়ি নিলে কিছুটা দূরে পার্ক করতে হতে পারে। রাস্তাটায়

আপনাদের গাড়ি ঢুকবে না।'

'তাহলে বাসে নয়ত রিকশায় যাব!' নিনি পাশ থেকে বলে উঠল।

'তুই এখনো যাসনি?' তিন্নি তাড়া লাগালেন। 'যা যা! তোর রেডি হতেই লাগবে দুঘন্টা!'

নিনি বলল, 'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি!'

তারপর সে চঞ্চলা হরিণীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

তিন্নি বললেন, 'আপনি একা সামলাতে পারবেন তো?'

মিজান কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'একা কেন? আপনি যাবেন না?'

'বাড়িটা তো খালি হয়ে যাবে। বুয়ার ওপর সব কিছু দিয়ে ভরসা পাই না!'

'নিনি যদি পথেই পাগলামি আরম্ভ করে দেয়?'

'তেমনটি করবে না! ঘুরতে পারলে ও সবচে বেশি ভাল থাকে!'

মিজান তবুও মনে মনে দুশ্চিন্তায় ভোগে। নিনিকে তো সে তেমন জানে না। নিনিও তাকে জানে না।

বুয়া চা নিয়ে এলে মিজান কাপ হাতে নিয়ে ভাবে টাকার কথাটা বলবে কিনা! শেষে ঠিক করল বলবে না। মোটে তো দুশো টাকা মাত্র!

'আপনি চা খান। আমি একটু উপর থেকে আসি!'

তিন্নি উঠে উপরে চলে গেলেন।

মিজানের চা খাওয়া শেষ হবার আগেই নিনি উপরের বারান্দার রেলিঙের কাছে এসে হাত নেড়ে বলে, 'হাই! আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে আসছি!'

মিজান হেসে মাথা কাত করে।

তারপরই নিজকে খুব একা মনে হতে থাকে তার। সময়টাকে মনে হয় দীর্ঘ। সে একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ উল্টে-পাল্টে রেখে দেয়। ভাল লাগছে না। মাথায় আবার টিক্কা হারুনের ব্যাপারটা বুদবুদ তোলা আরম্ভ করে দিয়েছে।

তিন্নি এসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন, কেমন টাকা খরচ হতে পারে আপনি তো আর জানেন না! এই টাকা ক'টা সাথে রাখেন!'

মিজান বলতে যাচ্ছিল, টাকা আবার কেন? কিন্তু কিছু না বলে টাকাটা নিল।

তিন্নি বললেন, 'এখানে পাঁচ হাজার আছে। আপনার থেকে যেন একটা টাকাও খরচ না হয়!'

মিজান হাসল। বলল, 'আমার টাকাগুলোতে কি খারাপ কিছু আছে?'

'তা নেই! তবে আমার মনে হয় আপনার সাথে আপাততঃ খুব বেশি টাকা নেই।'

নিনি সিঁড়ি বেয়ে নাচতে নাচতে নামতে লাগল। টাকার কথা শুনে বলল, 'আমার কাছেই অনেক টাকা আছে বুবু! তুমি দিও না!'

তারপর সে তার বুবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বুবু? তুমি রেডি হওনি?'

'না রে! আমার আজ যাওয়া হবে না! তুই যা!'

'তাহলে আমিও যাব না!'

তিন্নি ছোটো বোনের গালে আদর করে বললেন, 'আমার লক্ষ্মী-টুনটুনি বোন! আমি গেলে টনি একাএকা ভয় পাবে না? তুই আজ যা। কাল তুই টনিকে দেখবি, আমি তখন যাব। কেমন?'

'আচ্ছা!'

তারপরই নিনি আবার বলল, 'ড্রাইভারটা আজও এল না। একটা ড্রাইভার রাখতে পার না?'

'রাখব! রাখব! তুই আজ ঘুরে আয়! তারপর দেখা যাবে!'

নিনি বলল, 'এই যে, কি যেন নাম আপনার?'

মিজান শুধু হাসল। কিন্তু নিজের নামটা বলল না।

নিনি বলল, 'মিজান, মিজান! চলেন!'

তারপর বলল, 'রিকশায় করে যাব কিন্তু!'

মিজান বলল, 'আগে দেখি। রিকশা না বাস কোনটা পাওয়া যায়!'

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ-পত্র সব নিয়েছেন তো?'

'এগুলো আমার ব্যাগেই থাকে!'

কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগটা দেখাল নিনি।

তিন্নির দিকে তাকিয়ে মিজান বলল, 'চলি আপা!'

'আচ্ছা!' বলে মাথা নাড়লেন তিনি।

তারপর বললেন, 'প্রবলেম হলে ফোন করবেন!'

'ঠিক আছে!' বলে, মিজান দরজার দিকে এগোয়।

পেছন থেকে নিনিকে আস্তে-আস্তে তিন্নি বললেন, 'দুষ্টুমি করবি না কিন্তু! মিজান রেগে গেলে তোকে একা ফেলেই চলে যাবে! তখন, একাএকা বাসায় ফিরতে পারবি?'

'না না আপা! একটুও দুষ্টুমি করব না!'

'মিজান যা বলে তাই শুনবি!'

'আচ্ছা!'

নিনি হালকা পায়ে বাতাসে ভর করে যেন বাইরে বেরিয়ে আসে।

একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়েই মিজানকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে, 'ওই তো রিকশা!'

মিজান বলল, 'রিকশায় না। অটোতে যাব!'

তারপর নিনির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় মিজান। এমন সুন্দর! অথচ নিয়তির কি অদ্ভুত এক শিকার!'

দুই

শাহবাগ হয়ে শিশু পার্কের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিনি চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'এই থামাও! থামাও!'

অটোর ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে ফেলল।

মিজান নিনির ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'অমন চেঁচামেচির কি হল?'

'আমি পার্কে যাব!'

'পার্ক এখনো খোলেনি। বিকেলে খুলবে।'

'তাহলে কখন যাব পার্কে? আমার যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে!'

মিজান ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি গাড়ি চালান! আমি না বললে থামবেন না! আমাদের এগারোটার আগেই পৌঁছতে হবে!'

অটো চলতে লাগল।

মিজান নিনিকে বলল, 'আপার কথা কি ভুলে গেলেন?'

নিনি আরো কাছ ঘেঁষে এসে মিজানের একটা হাঁটু চেপে ধরে বলল, 'কোন কথাটা?'

'ওই যে বলল, আমার সব কথা শুনতে!'

'আমি তো একটুও ভুলিনি! আপনার সব কথা শুনব!'

'তাহলে, আর চেঁচামেচি করবেন না!'

'পার্কে যাব কখন?'

'ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসার সময়।'

নিনি খুশি হয়ে মিজানের হাঁটুটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওহ্! সুপার! আমার কী যে খুশি লাগছে!'

তারপর মিজানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি খুব ভাল!

টুটুল আমাকে একটুও ভালবাসে না! আমার কোনো কথাও শোনে না!'

মিজানের বুকের কোথায় যেন একটু খঁচখঁচ করে। তবুও সে বলল, 'আমি ভাল কি করে বুঝলেন?'

'এই যে আপনার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি! আবার তখন যে বললেন পার্কে নেবেন!'

মিজান কিছু বলল না। হাসল শুধু।

প্রেসক্লাব পেরিয়ে পল্টনের কাছে তাদের অটোরিক্সা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ল। ডান-দিকে বাম দিকে শুধুই লাল আর লাল। লোকজনের হাতে লাল ফেস্টুন, ব্যানার, ছোট লাল পতাকা। মাথায় লাল ফেটি বাঁধা। সেই সাথে প্রত্যেকটিতে হাতুড়ি-কাস্তের ছবি। মিজান ভাবে, কমিউনিজম এখনো আছে তাহলে? আশ্চর্য! লোকগুলো কি আজো বুঝতে পারল না যে, এই কঠিন বিষয়টা সাধারণ মানুষকে বোঝানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার?

নিনি বলল, 'ওদের সবাই লাল রঙের এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?'

মিজান ভাবছিল, মিছিলটার জন্যে আবার তাদের না অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে যায়! নিনির কথায় সে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এরা সবাই কমিউনিষ্ট পার্টি করে। আজ মনে হয় এদের মিটিং আছে।'

'মিটিং করে কি হবে?'

মিজান বলল, 'এটা ওরাই বলতে পারবে!'

তারপর বিরক্তি চেপে বলল, 'আপনি গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসবেন?'

নিনি হাই তুলে বলল, 'নাহ্! আমার ঘুম পাচ্ছে!'

তারপর মিজানের কাঁধে মাথাটা রেখে বলল, 'এখানে মাথাটা রাখলে কি রাগ করবেন?'

মিজান বলল, 'আপনার লজ্জা করবে না?'

'মাথাটা রেখে একটু রেস্ট নেব। লজ্জার কি আছে?'

মিজানই আসল লজ্জাটা পায়। কিন্তু কিছু আর বলে না। বাইরের চলমান লালের দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করে এই জনস্রোত কখন থামবে!

নিনি মিজানের কাঁধে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। নাকি ভান করল? সে ঘড়ির দিকে তাকায়। দশটা দশ! তার টেনশন হতে থাকে। আর একঘন্টায় আরমানিটোলা যাওয়া কি সম্ভব?

ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে যাওয়ার জন্যে ইশারা করে। ড্রাইভার অটো স্টার্ট দিয়ে ডান দিকে টার্ন নিয়ে নওয়াব পুরের দিকে এগোতে থাকে।

অটোর বিকট শব্দেও নিনির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। শিশুর মত একহাতে মিজানের বুকের কাছে সার্টটা খামচে ধরে রেখেছে।

নিনির ঘুমন্ত মুখটা আরো নিষ্পাপ মনে হচ্ছে। কী নিশ্চিন্তেই না নির্ভর করেছে মেয়েটা! অটোর ঝাঁকুনিতে যাতে নিনি সামনের দিকে হেলে পড়ে না যায়, সে জন্যে মিজান দু হাতে তাকে আলতো করে জড়িয়ে রাখে।

ঠিকঠাক মত অটো চালিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের সামনের গলিতে আসতেই মিজান ড্রাইভারকে বলল, 'রাখেন!'

ড্রাইভার পেছন ফিরে বলল, 'এহানেই?'

'হ্যাঁ।'

তারপর নিনিকে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম থেকে জাগায়।

চোখ খুলে নিনি বলল, 'কোথায়?'

'ডাক্তারের কাছে এসে গেছি!'

নিনি বলল, 'ডাক্তার কি আমাকে মা হবার ওষুধ দিতে পারবে? টুটুল বলেছে আমার পেটে কোনো বাচ্চা নেই!'

মিজান অবাক হয়ে তাকায় নিনির দিকে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিনির একটা হাত ধরে গলি দিয়ে চেম্বারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে মিজান।

ডাক্তার অপেক্ষায় ছিলেন।

মিজান তাঁকে সালাম দিতেই নিনিও দেখাদেখি ডাক্তারকে সালাম দেয়।

ডাক্তার সাহেব অল্প একটু হেসে বললেন, 'ইয়াং ম্যান! আজ বহুবছর পর আপনাকেই দেখলাম পাংচুয়াল!'

মিজান বলল, 'তাই? শুনে খুব ভাল লাগছে!'

'পেপার্স এনেছেন?'

নিনি বলে উঠল, 'এগুলো আমার ব্যাগেই থাকে!'

'ভেরি গুড!'

তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখি, ওগুলোতে কি কি আছে?'

নিনি ব্যাগ থেকে একটা মোটা মত খাম বের করে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে সবগুলোই আছে!'

খামটা নিতে নিতে ডাক্তার নিনিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো খুব সুন্দর করে সাজতে পারেন! কে সাজিয়ে দিয়েছে?'

'আমি নিজেই!'

'সাজতে খুব ভাল-াগে?'

'খুউব!'

'কেন?'

'যখন মনে হয় আমাকে কেউ ভালবাসে!'

'তখনই সাজেন?'

'হ্যাঁ!'

'আজ কেন সাজলেন?'

নিনি হেসে মিজানকে দেখিয়ে বলল, 'এর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছি তো তাই!'

ডাক্তার কাগজগুলো একটা একটা করে উল্টে দেখছিলেন আর ফাঁকে ফাঁকে নিনিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এক সময় তিনি বলে উঠলেন, 'তাহলে বলতে চাচ্ছেন এ আপনাকে ভালবাসে?'

'বাসেই তো!'

কাগজগুলো আবার খামের ভেতর ভাঁজ করে ঢুকিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'তাই?'

তারপর মিজানের দিকে একবার তাকিয়ে নিনিকে বললেন, আপনার কি করে মনে হল যে, 'ইনি আপনাকে ভালবাসেন?'

'বাহ! আমি জানব না? এই যে, আপনার কাছে আমাকে নিয়ে এল। আবার ফিরে যাবার সময় পার্কে নিয়ে যাবে বলেছে!'

তারপর একটু থেমে চোখ বড় বড় করে বলল, 'জানেন ডাক্তার! আসবার সময় অটোতে বসে ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমের ভান করেছিলাম। পথে ও আমাকে একটুও ডিস্টার্ব করেনি!'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই নিনি আবার বলতে লাগল, 'আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি পড়ে যাব ভেবে ও আমাকে কত্তো সুন্দর করে জড়িয়ে রেখেছিল! আমি যে জেগে আছি ও বুঝতেই পারেনি!'

নিনি কথাগুলো বলে শব্দ করে হেসে উঠল।

মিজান কথাগুলো শুনছিল আর তার বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। মেয়েটা বলছে কি এসব?

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

তারপর মিজানের দিকে তাকিয়ে তেম্নি হেসেই বললেন, 'আপনি যে সত্যিই গুড বয়! তার প্রমান একটা পাওয়া গেল! কিন্তু পেশেন্ট এক সময় মেন্টাল হসপিটালেও ছিল। রিপোর্ট বলছে তেমন কোনো গুরুতর সমস্যা

নেই!'

মিজান বলল, 'ও যে এমন চালাকি করছিল সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি!'

'শুনুন মিজান সাহেব! মানুষের সবচেয়ে বড় অলঙ্কার কি জানেন?'

মিজান চুপ করে থাকে।

ডাক্তার তাঁর চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে দুহাতে চোখ ডলে নিয়ে বললেন, 'সেটা হচ্ছে বিশ্বাস! কেবল বিশ্বাসের জোরেই একটা অচেনা মানুষ আরেকটা অচেনা মানুষের ওপর ডিপেন্ড করতে পারে!'

তারপর বললেন, 'পেশেন্টের পেপার্স কিন্তু বলে না ওর কিছু হয়েছে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক! আমাদের সবার মাঝেই কিছু কিছু এ্যাব্নরম্যাল টেন্ডেন্সি আছে। কারোরটা মাঝে মধ্যে অন্যের চোখে পড়ে আর কারোরটা সারা জীবনেও কেউ বুঝতে পারে না। এরও এমন কিছু একটা। যা আমাদের চোখে বেশি বেশি ধরা পড়ছে বলেই এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। একা থাকলে এটা বেড়ে যায়। কিন্তু দেখবেন অনেক সদস্যের পরিবারে কিন্তু এমনটা টের পাওয়া যায় না। দেখা গেছে বদ্ধ উন্মাদও একান্নবর্তী পরিবারে থেকে গেছে। কিন্তু তাকে কেউ উন্মাদ বলে ভাবেনি বা তার পাগলামীটা কারো কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেনি। মেয়েটা একবার বলেছিল না যে, কেউ ভালবাসে মনে হলেই তার সাজতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাসের ভিত থাকা চাই! তা না হলে আমাদের মনের ভেতরকার নিরাপত্তাহীনতাই আমাদের এ্যাব্নরম্যাল করে দেবে স্ে-ি-পয়জনিঙের মত!'

কথাগুলো বলা শেষ করে তিনি আবার বললেন, 'এর হাজবেন্ড একে সেই বিশ্বাসের ভিত দিতে পারেনি বলেই তার কাছে এটা নরম্যাল মনে হয়নি! তাই ডাক্তারের কাছে যাওয়াকে মেয়েটা তার সাময়িক মুক্তির একটা মাধ্যম হিসেবে ধরে নিয়েছে। নয়তো ঘরের ভেতর তাকে সারাক্ষণ একা একাই কাটাতে হবে। সেই নিঃসঙ্গতার ভয় তাকে অস্থির করে তুলেছে! আমার মনে হয় ঠিকমত সঙ্গ পেলে আর বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে গেলে এমনটা দিন দিন কমে আসবে! তবুও আরো দু-চারবার আসতে হবে। কোনো চিকিৎসা নয়। এম্নি এম্নিই আসতে হবে। কোনো ফি-টাকা পয়সা নেব না। মাস ছয়েক ওকে সঙ্গ দিন। তারপর একদিন একটা সিটিঙেই বাকিটা ঠিক হয়ে যাবে। তো এর বিশ্বাসটা যেন কিছুতেই ভাঙবেন না। পি-জ! জীবনে সুখি হবেন!'

নিনি বলল, 'আমার বাচ্চা হবে কবে?'

ডাক্তার নিনির দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। চশমাটা খুলে রুমালে কাচ পরিষ্কার করে বললেন, 'বিয়ে হয়েছে কত বছর?'

'আট বছর।'

'মাত্র আট বছর?'

'টুটুল তো বলেছে আমার কখনো বাচ্চা হবে না।'

ডাক্তার মিজানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টুটুল কে?'

'ওর হাজবেন্ড। ইটালিতে আছে। কিছুদিন হল একে দেশে রেখে গেছে।

মিজানের কথা শুনে তিনি আবার রিপোর্টগুলো নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিন্তু এমন কোনো রিপোর্ট তিনি পেলেন না। বললেন, 'হবে হবে। টুটুল কিচ্ছু জানে না! বাচ্চা কেন হবে না? হয়ত দেরি করেই হবে। আরে আমি তো আমার বাবা মায়ের বিয়ের এগার বছর পরে জন্মেছি। ভুল বুঝবেন না। অনেক সময় ছেলেদের দোষেও মেয়েরা মা হতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজ মেয়েটাকেই বন্ধ্যা বলে!'

তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিনিকে বললেন, 'এই যে ইয়াং লেডি! আপনি এর কথাগুলো শুনবেন তো?'

নিনি মাথা হেলিয়ে বলল, 'সবই তো শুনি!'

'গুড! বেশি করে শুনবেন কেমন? আর মাঝে মাঝে আমার এখানে দুজনেই বেড়াতে আসবেন। আসবেন তো?'

নিনি বলে, 'আসব!'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনারা আজ চলে যান। দুহপ্তা পরে এমন দিনে ঠিক এমন সময়েই আসবেন। আমি অপেক্ষা করব!'

মিজান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। ডাক্তার সাহেব কি ধরেই নিয়েছেন নিনি তার প্রেমিকা! জীবনে সুখি হবার কথা বলে উনি আসলে কি বোঝাতে চাইলেন?

চেম্বার থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। একটা লোক ঘুঘনি বিক্রি করছিল। ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা লোকটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। নিনি জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে ওরা ভিড় করে আছে কেন?'

মিজান ঘুঘনির বড় সসপ্যানটা প্রথমেই দেখতে পেয়েছিল। বলল, 'ঘুঘনি বিক্রি হচ্ছে।'

'ওহ্ ঘুঘনি! দারুণ টেস্টি! আমিও খাব!'

মিজান বলল, 'না! ওসব খেতে হবে না। পাঁচা-গান্ধা কিনা কে জানে!

তেতুলের পানি মেশায় বলে পাঁচা-গান্ধা হলেও বুঝতে পারবেন না! খেয়ে পেট খারাপ হতে পারে!'

নিনি অভিমান করে দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর মিজানের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি আমার বাবার কথাটা কোথায় পেলেন? ছোট বেলা বাবাও এই কথাটাই বলতেন!'

'তাহলে তো দেখছি খুব ভাল একটা কথা বলেছি!'

বেশি না! শুধু দুটাকার খাব! না করবেন না! পি-জ!'

নিনি তার ব্যাগ হাতড়ে খুচরো টাকা পেল না। ঘুঘনি বিক্রেতাকে বলল, 'আপনার কাছে এক'শ টাকার ভাংতি হবে?'

লোকটা বিগলিত হাসি হেসে বলল,' না আপা! হপায় আইলাম! দশট্যাকাও বিকাইবার পারি নাই!'

নিনি মিজানকে বলল, 'আপনার কাছেও দুটো টাকা নেই?'

মিজান বলল, 'দেখছি!'

তারপর পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে খুলে বলল, 'এক টাকা আছে!'

'ওতেই চলবে!'

নিনি টাকাটা নিয়ে গিয়ে লোকটাকে বলল, 'এই যে ঘুঘনি ভাই! এক টাকার ঘুঘনি হবে?'

লোকটা তার কারবার দেখে হাসছিল। বলল, 'এক ট্যাকার আর কতটি দ্যাওন যাইবো?'

মিজান বলল, 'আমার কাছেও খুচরো নেই। ছোট নোটের মধ্যে আরেকটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে!'

'থাইক। লাগবো না!'

তারপর ঘুগনি বানিয়ে কাগজের একটা কোণ তৈরি করে নিনির হাতে তুলে দিল। সাথে একটুকরো শক্ত কাগজ।

নিনি শক্ত কাগজের ছোট্ট টুকরোটা দিয়ে চামচের মত বানিয়ে একটু ঘুগনি মুখে পুরেই বলল, 'ওফ্! সুপার!'

মিজানের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'সেই স্টুডেন্ট-লাইফে খেতাম। আর অনেকগুলো বছর পর আজ খাচ্ছি!'

মিজান বলল, ভাল লাগছে?

'খুব!'

একটা মিশুক এসে তাদের সামনে থামল। চালক বলল, 'মিশুকে

যাইবেন?'

মিজান বলল, 'কোথায়?'

লোকটা হেসে ফেলল। বলল, 'আপনেরা যেহেনে যাইতে কন!'

'ধানমন্ডি যাবেন?'

লোকটা কিছু বলার আগেই নিনি বলে উঠল, 'না শিশুপার্ক!'

মিজান বিরক্ত হয়ে বলল, 'শিশুপার্কের পোকাটা এখনো যায়নি?'

নিনি বলল, 'পোকা বলছেন কেন? ইচ্ছে বলতে পারেন না?'

তারপর সে হাতের ঘুঘনির কাগজটা ফেলে মিশুকে চড়ে বলল, 'মিজান উঠে আসেন!'

মিজান উঠে নিনির পাশে বেশ কিছুটা ফাঁকা রেখে বসল।

চালক মিশুক ছেড়ে দিতেই নিনি মিজানের কাছ ঘেঁষে এল। গোলাপ শাহ্ মাজারের কাছ দিয়ে বাঁ দিকে টার্ন নিতেই নিনি বলল, 'এটাও রিকশার মতই। সামনে কেবল মটর সাইকেল ফিট করে নিয়েছে!'

তারপর মিজানের একটা বাহু ধরে বলল, 'চাকাগুলো তো একই। না?'

'তাই!' বলে হাসল মিজান।

পার্কের কাছে মিশুক থামতেই নিনি আগে আগেই নেমে পড়ে।

তারপর ফুটপাতে উঠে ব্যাগ খুলে বলল, 'ভাড়া আমি দেব!'

মিজান বলল, 'ওর কাছে চেঞ্জ হবে না।'

নিনি ততক্ষণে একটা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছে মিশুকের ড্রাইভারের দিকে।

মিজান ওয়ালেট হাতে নিয়ে মিশুক থেকে নেমে নিনির পাশে দাঁড়ায়।

ড্রাইভার নিনিকে পঞ্চাশ টাকা ফেরত দিলে সে বলল, 'এত বেশি ভাড়া?'

মিজান বলল, 'বেশি নেয়নি!'

'আপনি বলছেন?'

মিজান মাথা দোলায়।

ব্যাগে টাকা রাখতে রাখতে নিনি বলল, 'চলেন, পার্কে ঢুকি!'

পার্কের সামনে নানা রকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। নিনি সেদিক দিয়ে যাবার সময় বলে উঠল, বাহ! দেখতে খুব দারুণ তো!'

তারপর সে নানা রকম চুলের ক্লিপ, কাঁটা, কানের ফুল-দুল-ব্যান্ড

কিনে ফেলল। সুযোগ পেয়ে দোকানদাররাও ওকে ঠকিয়ে কিছু বাড়তি পয়সা আয় করে নিতে ছাড়ল না।

মিজান নির্বাক দর্শক হয়ে রইল। কারণ এসব জিনিস-পত্রের দামের সঙ্গে কোনো কালেই পরিচিত ছিল না সে।

নিনির সদ্য কেনা জিনিসগুলো দিয়ে মোটামুটি বড়-সড় একটা প্যাকেট হয়ে গেল। বলল, 'এটা তো আমার ব্যাগে জায়গা হবে না। আপনি কি ধরবেন? পি-জ!'

মিজান তার বিরক্তি মনেই লুকিয়ে রাখে। নিনির হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে বলল, 'সারাক্ষণ হাতে রাখতে হলে তো মুশকিলে পড়ে যাব!'

দুহাত দিয়ে প্যাকেট ধরে রাখার ফলে কর্তৃত্বটা চলে গেল নিনির হাতে। টিকেট কাউন্টারে গিয়ে দুটো টিকেট নিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল, 'আমি শুধু নাগরদোলায় আর টয়-ট্রেনে চড়ব। আপনি?'

মিজান বলল, 'আপনার প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব! '

নিনি বলল, 'কোনোটাতে চড়বেন না?'

'নাহ্! এগুলোতে চড়তে আমার ভাল লাগে না!'

'টিকেট কোথায় পাওয়া যাবে?'

মিজান কাউন্টারটা দেখিয়ে দিয়ে বলল,' শুধু আপনার জন্যেই দুটো টিকেট কিনবেন!'

নিনি বলল, 'আপনি এলেই বেশি ভাল লাগত। এই যে আপনার সাথে এসেছি, আমার খুব ভাল লাগছে!'

টিকেট নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নিনি বলল, 'জানেন, টুটুলের সাথে কোথাও বেড়াতে পারিনি! একাএকা বেড়াতে কি ভাল লাগে? আপনিই বলেন!'

মিজান কি বলবে ভাবছিল। এরই মধ্যে নিনি আবার বলতে শুরু করে, 'সারাদিন একা। মিলানে থাকতে সারাক্ষণ আমার মন খারাপ হয়ে থাকত! একটু কথা বলব, সুখ-দুঃখের কথা বলব সে সুযোগই নেই। কারোরই সময় হয় না।'

'কেন সময় হয় না?'

'কাজ আর কাজ! সব চাকরের দল! দিন রাত চাকরি নিয়েই ব্যাস্ত! শেষের দিকে সবাই আমাকে এ্যাভয়েড করত!'

মিজান ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে বলল, 'আমিও তো কাজ করি। সারাদিন টিউশানি করে বেড়াই। আপনাকে কখন সময় দেব?

আপনার মন খারাপ হবে না?'

নিনি বলল, 'একটু তো হবেই! সপ্তাহের পুরো সাতদিনই আপনার টিউশানি থাকে না! তাই না?'

'তা অবশ্য থাকে না!'

নিনি বলল, 'চলেন ওই বট-গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসি।'

'আচ্ছা বেশ!'

কিশোরীর উচ্ছ্বলতায় নিনি দৌঁড়ে গিয়ে টিলার মত উঁচু জায়গাটায় উঠে গিয়ে মিজানের দিকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল। কেউ কেউ নিনির কান্ডে মন্তব্য করল, পাগলী!

নিনির কাছে পৌঁছতে মিজানকে বেশ কসরত করতে হয়েছে। ফলে কিছুক্ষণ সে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়।

নিনি হেসে বলল, 'এত অল্পতেই হাঁপিয়ে গেছেন?'

মিজান ধাতস্ত হয়ে বলল, 'বয়েস হচ্ছে না!'

পাথরের বেঞ্চে বসে নিনি বলল, 'কত আর হয়েছে! চলি-শ হয়েছে?'

মিজান নিনির পাশে বসতে বসতে বলল, 'নাহ্! অত হবে না। খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ!'

'তাহলে কি আর এমন বয়েস! আমারই তো চলছে বত্রিশ!'

'যা! আমি তো ভেবেছি সাতাশ-আঠাশ হবে! ডাক্তারের কাছেও তা-ই বলেছি!'

'আসলে আমি রেগুলার এক্সারসাইজ করি, তাই বয়েসটা তেমন চোখে পড়ে না!'

মিজানের মনে হল নিনি এখন সম্পুর্ন স্বাভাবিক। পাগলামীর কোনো লক্ষণ নেই। তাহলে ব্যাপারটা তার মাঝে-মধ্যেই হয়। এখন তো খুব ভালই কথা বলছে। আচরণও ভাল। তাহলে?'

মিজান ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিনির মুখের দিকে।

নিনি বলল, 'অমন করে কি দেখছেন? প্রেমে পড়ে যাননি তো?'

মিজান গম্ভীর ভাবে বলল, 'ভাবছি!'

'ভাবনাটা কি শুনতে পারব?'

'ভাবছি! এমন একটা মাথা খরাপ মেয়ের প্রেমে পড়াটা ঠিক হবে কিনা!'

'ভালই হবে!' নিনি হেসে উঠে বলল, 'আসবার সময় দেয়ালে একটা

সিনেমার পোস্টারে দেখলাম লেখা আছে পাগলীর প্রেম!'

মিজান বলল, 'আচ্ছা নিনি! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন তো?'

'আপনি কি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলব! কি জানতে চান?'

'আমার ধারণা আপনি মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করেই অমন এ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার করেন। ঠিক বলেছি?'

নিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আবার বেঠিকও!'

'এটা কেমন উত্তর হল?'

'এক্সপে-ন করছি। আর তা হল, কখনো কখনো সত্যিই আমার মাঝে একটা পাগলামীর মতন ব্যাপার কাজ করে। তখন আমি অন্যদের বিরক্ত করে আর জ্বালাতন করে মজা পাই। আবার কখনো খানিকটা নিজের ইচ্ছাও যোগ করে দেই।'

'ডাক্তারের কাছে বলেননি কেন?'

নিনি সেটার জবাব না দিয়ে বলল, 'বিয়ে করেছেন?'

'করেছিলাম!'

নিনি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'করেছিলাম কি?'

মিজান বলল, 'থাক ওসব কথা! আপনার পাগলামীটা যে ভান, ডাক্তারকে কেন বলেন নি?'

'ডাক্তার আমার সমস্যাটা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করি। আর এমন না করলে টুটুলের সাথে আমার কী নিয়ে বিরোধ টুটুলকে কেন সহ্য করতে পারি না! এমন ধরনের হাজারো প্রশ্ন উঠবে! আমি এত কথার জবাব কিভাবে দেব?'

নিনির কথা শুনে মিজান আরো অবাক হয়ে যায়।

নিনি বলল, 'বিয়ের পরই দিন দিন টুটুল আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ও আমার কাছে এলে ঘিণ-ঘিণে মনে হতো।বমি বমি মনে হত। দিন দিন সেটা বেড়েই চলছিল। একদিন লুকিয়ে ওখানকার এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, টুটুলের দোষটা কি? কেন তাকে ঘিণ-ঘিণে লাগে? কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি। অনেক ভেবেছি। টুটুলের কোনো দোষই পেলাম না। মিথ্যে দোষ দেব সেটাও সম্ভব না!'

মিজান বলল, 'যেমন?'

‘আপনি বললে কি বিশ্বাস করবেন? ইটালির মত এমন একটা আধুনিক দেশে টুটুলের কোনো মেয়ে বন্ধু নেই যার সাথে সে রাত কাটাতে পারে! ড্রিঙ্ক করে মাতাল হয়ে বউকে গালাগালি মারধর করে তাও না! আমার প্রতি অমনোযোগ? তাও না!’

মিজান বলল, ‘তাহলে তো দেখছি আপনার হাজবেন্ড খুবই ভাল!’

নিনি বলল, ‘শুধু ভালই না! অসম্ভব ভদ্রও! দেখতেও দারুণ হ্যান্ডসাম! প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়বার মতন চেহারা!’

‘আপনার প্রবলেম হচ্ছে কেন?’

‘এত্ত ভাল কেন ও? ওটাই আমার অসহ্য! একটু খারাপ হতে পারতো না? বউকে একটু সন্দেহ করা, এক আধটু ধমক দেয়া, একটু মান-অভিমান কি হতে পারতো না? তিন-চারদিন বাইরে থাকলেও কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারে না কোথায় ছিলাম! আমি মিথ্যে করেও অনীহা প্রকাশ করলে কিছুটা জোর খাটাতেও তার রুচিতে বাঁধে! হাজবেন্ড এক-আধটু জোর করবে এটা তো সব বউই চায় নাকি?’

‘তাহলে টুটুল সাহেবের খুব বেশি ভালমানুষ হওয়াটাকেই বলছেন তার আসল ব্যর্থতা?’

‘এগজাক্টলি!’

‘আপনাদের দুজনের এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।’

‘মোটেও না। ও সরি সরি করে আরো গুটিয়ে যেতো নিজের ভেতর!’

মিজান বলল, ‘তাহলে সত্যিই সমস্যার কথা!’

তাই এই ভান করা শুরু করলাম। ওকে জ্বালাতন করতে করতে প্রায় পাগল করে তুললাম। এমন একটা ফেরেশতার মত মানুষকে কি করে বলি যে, তালাক দাও!’

‘তারপর?’

তারপর ও নিজেই ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে বলেছে ডিভোর্সের কথা! ভাব দেখিয়েছি যে, বুঝতে পারিনি! আপা-দুলাভাইকেও এখন পর্যন্ত কিছু বুঝতে দেইনি!’

‘আমাকে যে সবই বলে দিলেন!’

‘আপনিই একজন, যে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন।’

‘আসলে আপনার আপা-দুলাভাই কেউ আপনার দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি কখনো। দিলে ঠিকই বুঝতে পারত।’

নিনি বলল, ‘আপনি কি সবাইকেই এমন মনোযোগ দিয়ে দেখেন?’

‘না। কেবল আমার সামনে যে থাকে বা যার সাথে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা থাকে।’

‘বাদ দেন তো!’ বলে, নিনি তার একটা হাত বাতাসে ঝাপটা মেরে বলল, ‘আপনি ত এক্ষুনি সবাইকে বলে দিচ্ছেন না!’

মিজান একটু ঝুঁকে বলল, ‘বলতেও তো পারি!’

‘আপনি তেমন নন। এক আধটু খারাপ মানুষ হলেও বিশ্বাসী! আপনি অন্যের গোপন কথা গোপন রাখতে জানেন!’

‘একদিনেই এমন ধারণা হওয়াটা মোটেও ঠিক না।’

‘একদিন কি করে ভাবলেন? আপনাকে আজ আটমাস ধরে দেখছি। ভাল লাগলো বলেই আপনাকে নিয়ে বের হবার সুযোগ বানিয়ে নিলাম। আমিও যে দেখতে খারাপ নই বা একেবারেই আপনি পছন্দকরতে পারছেন না সেটা তো বুঝতেই পারছি!’

মিজান বলল, ‘থেমে গেলেন যে!’

‘আমরা এখন উঠব!’

‘আপনার নাগর দোলায় চড়া হল না তো!’

‘ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিনি বলল, নাগর দোলায় না চড়লাম! সঙ্গে তো নাগর রয়েছেই!’

তারপর প্রায় দৌঁড়েই সে ঢাল বেয়ে নেমে গেল।

মিজান কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো বিমূঢ়ের মত। অকস্মাৎ ধাক্কাটা হজম করতেও সময়ের প্রয়োজন।

তিন

মিজান নিচে নেমে আসতেই নিনি বলল, ‘আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। চলেন বাইরে কোথাও খেয়ে নেই!’

‘আপনার আপা নিশ্চয়ই এতক্ষণে দুশ্চিন্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন! বাসায় ফিরে যাওয়াটাই বেটার!’

নিনি বলল, ‘তাহলে বেস্ট হবে বাসায় একটা ফোন করে দেই! কোথাও পাবলিক কল সেন্টার আছে?’

‘আছে! কোন ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকেই করা যাবে! আপনি বরং ঘরেই চলে যান! অনেকক্ষণ বাইরে আছেন! তাছাড়া তিনটার সময় আমার

একটা টিউশানিতে যেতে হবে!'

নিনি জিজ্ঞেস করল, 'এখন সময় কত?'

মিজান কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, 'দেড়টা!'

নিনি বলল, 'অনেক সময় আছে!'

তারপর আবার জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, এখানে কোথাও দুপুরের খাওয়া সারবার ব্যবস্থা নেই?'

'আছে! শাহবাগে মৌলী বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে!'

'চলেন, ওখানেই যাই!' নিনি প্রস্তাব দেয়।

মিজান কিছুক্ষণ নিনির দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যাজার মুখে।

নিনি মিজানের একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, 'আরে সাহেব চলেন তো!'

পার্ক থেকে বেরোবার জন্য ওরা গেট বরাবর হাঁটে।

নিনি বলে, 'আমার ব্যাপারে আপনি কোনো মতামত দিতে যাবেন না যেন! তাহলে কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাব!'

'কি রকম?'

'এই যে আপনাকে এত কিছু বললাম! আসলে আমার কোনো অসুখ বিসুখ নেই! ভান করছি একটু একাএকা কদিন থাকব। নিজকে নিয়ে ভাবব। কি পেলাম আর কি পাবো না সেটা নিয়ে বিচার বিশে-ষণ করব। মাঝে মধ্যে আপনাকে আমার দরকার হবে। তখন পালিয়ে থাকবেন না যেন!'

পার্কের গেট দিয়ে বেরোবার সময় মিজান আগে আগে বেরিয়ে আসতে নিনি কিছুটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সে অপেক্ষা করে নিনির জন্যে।

বাইরে বেরিয়েই মিজানকে দেখতে পেয়ে নিনি একটু হেসে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে বুঝি হারিয়েই ফেললাম!'

'সে ভয় নেই!'

'ভেবে বলছেন তো?'

মিজান কিছুটা দমে গেল। নিনি কি কিছু মিন করছে?

শাহবাগের কিে হাঁটা শুরু করে দিয়ে নিনি আবার বলল, 'আমার গার্ডিয়ান বলতে আপা আর দুলাভাই। বাবা-মায়ের আদর বলতে গেলে তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি। খুব ছোটো বেলা মাকে হারিয়ে বোনের কাছে মানুষ। তারপর সিক্সে পড়বার সময়ই বাবা চলে গেলেন। ভীষন একা হয়ে গেছিলাম। দুলাভাই তখন থেকেই আমার বাবার শূন্য জায়গাটা ভরাট করে রেখেছেন। এখন ভাবছেন টুটুলের কাছ থেকে ডিভোর্সের পেপারগুলো

পেয়ে গেলে আর আমি সুস্থ হয়ে উঠলেই আমাকে আবার বিয়ে দিয়ে দেবেন! তাই কিছুটা ভয়ে আছি! আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি।' বলে, মিজান ঠোঁট চেপে মাথা দোলায়।

নিনি মিজানের বুকের কাছে সার্টের ওপর থেকে ময়লা জাতীয় কিছুএকটা টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে বলল, 'তাই ঠিক করেছি নিজের মত কিছুদিন থাকব। আপনার হেল্প কিছুটা পেলে মনের জোর একটু বাড়ত!'

মিজান হেসে বলল, 'কিছুটা হেল্প অবশ্য করতে পারব। তবে আজকের মত এমনটা ঘনঘন হতে থাকলে আমার বেশ কিছু টিউশানি হারাতে হবে!'

'অমন ক্ষতিকর ভাবে আপনার সঙ্গ চাইব না। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

তারপর মৌলীতে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিয়ে নিনি আস্তে করে বলল, 'দারুণ তো! এখনকার মেয়েরা দেখছি অনেক এগিয়ে গেছে!'

মিজান দেখলো চারটে সমবয়সী মেয়ে পুরুষদের পাশাপাশি একটা পুরো টেবিল দখল করে কফি খেতে খেতে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। পাশের টেবিল থেকে উৎসুক পুরুষ দৃষ্টিগুলো ওদের কোনো রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না।

নিনি একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে মিজানকে পাশে বসতে বলল।

তখনই ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনেরা কি খাইবেন?'

মিজান বসে বলল, 'ভাতের সাথে কি কি খাওয়া যেতে পারে?'

ছেলেটা একনাগারে অনেকগুলো আইটেমের নাম বলে গেল। ওরা কোনো কোনোটা বুঝতেই পারলো না। নিনি বলল, 'কাঁচকি মাছ আর টাকি মাছের ভর্তা!'

তারপর মিজানের দিকে ফিরে নিনি বলল, 'অ্যানি চয়েস?'

মিজান বলল, 'চিকেন কারি আর ডাল!'

নিনি বলল, 'এ আইটেমের কথা বলেছে নাকি?'

নিনি ওয়েটারকে বলল, 'বলেছ?'

'জ্বি।'

'গুড! এবার নিয়ে এস! কুইক!'

মিজান নিনিকে যতই দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। আর মনেমনে ভাবছে, মেয়েটা কেমন করে নিজকে আড়াল করে রাখে সবসময়?

খাবার এসে যেতেই চামচ দেখে নিনি বলল, বাঙালি কি সবাই স্মার্ট হয়ে গেছে? ভাতও খায় ইংরেজি কায়দায়?'

মিজান বলল, 'এখানে স্টুডেন্টরাই বেশি আসে! তাদের হাত ধোবার সময় কম থাকে বলে এখন এটাই চালু হয়ে গেছে!'

'তাহলে আমরাও হাত না ধুয়ে চামচ দিয়েই কাজটা সেরে ফেলি!'

মিজান বেসিন থেকে হাত ধুয়ে এসে বলল, 'আমি এখনো এতটা হইনি। হাতের পাঁচ আঙ্গুলে ভাত মাখাতে না পারলে খেয়ে আমার পেট ভরে না!'

নিনি বলল, 'এই হল টিপিক্যাল বাঙালি!'

মিজান বলল, 'এটা আমার অহংকার!'

'ছাত্রজীবনে রাজনীতি করতেন?'

'ছাত্রজীবনে এক-আধটু সবাই রাজনীতি করে! পরে পেটের ধান্ধায় কেউ কেউ আমার মত হয়ে যায়!'

নিনি খেতে খেতে বলে, 'অনেক বছর পর এই কাঁচকি মাছ খেতে পেলাম!'

'কয়েক বছরের ভেতর খেতে পারেন নি?'

'এই মাছটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। পাব কোথায়? আমি তো আর বাজারে যাই না!'

মিজান বলল, 'রান্নাটা বেশ! কি বলেন?'

'তা না হলে কি এখনো খাচ্ছি?'

তারপর নিনি আবার বলল, 'আচ্ছা কিছু যদি মনে না করেন তাহলে কি একটু বলবেন?'

'কি শুনতে চান?' একটা হাঁড় চিবিয়ে গুড়ো করতে করতে বলল মিজান। 'আজ কি আপনার জানতেই হবে? নাকি অন্য দিন শুনলেও চলবে?'

'আপনার যেমন ইচ্ছে!'

'তাহলে আজ আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না!'

'ঠিক আছে! নেক্সট উইকের কোনো এক দিন।'

'না। দুসপ্তাহ পরে যেদিন আবার ডাক্তারের কাছে যাবেন!'

'আর কি যাবার দরকার আছে?'

'আছে!'

'কেন?'

'আপনার যে এটা ভান তা ডাক্তারকে খুলে বলবেন!'

'আপনি ভাবছেন ডাক্তার সাহেব গাধা! বুঝতে পারেননি! না?'

নিনি মিজানের দিকে ঘাড় বাঁকা করে তাকালো। তারপর আবার বলল, 'ডাক্তার সবই বুঝতে পেরেছেন। আপনি বুঝতে পারলেন না উনি কেন টাকা পয়সা নেবেন না বলেছেন?'

'সেটা তাঁর মুখ থেকে শুনলেই ভাল হবে।'

'আপাকে যদি সব জানিয়ে দেয়?'

'তাও বলবেন। সব সমস্যাই বলবেন!'

নিনি বলল, 'ভেবে দেখি!'

মিজান খাওয়া থামিয়ে বলল, 'কোনো ভাবাভাবি নেই। আপনি অবশ্যই বলবেন!'

'আমার ওপর জোর করছেন?'

'করলে কি খুব বড় অপরাধ হবে?'

'না। তা বলছি না! তবে, এক দিনেই অত ক্ষমতা পেয়ে গেলে পরে আবার মাথাটাই না কেটে বসেন!'

মিজান হেসে বলল, 'অতদুর ভেবে বলিনি। একটা খুব ভাল বুদ্ধিও উনি দিয়ে দিতে পারেন। আফটার অল মানুষের সমস্যা নিয়েই তো তাঁর কারবার! নাকি?'

'তা অবশ্য স্বীকার করছি!'

মিজানের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে উঠে গিয়ে বেসিন থেকে হাত ধুয়ে আসে।

তারপর টিসু পেপারে হাত মুছতে মুছতে নিনিকে তাড়া দেয় খাওয়া শেষ করবার জন্যে।

নিনি বলল, 'খেতে ভালই লাগছে। আরেক পে-ট ভাত নেব!'

মিজান হেসে উঠলো। বলল, 'আপনার পেটে রাক্ষস ঢুকেছে? এত খেলে তো দৈত্য হয়ে যাবেন!'

'ভাত খেয়ে কেউ দৈত্য হয়ে যায় না! আর রোজই তো আমি এত এত খাচ্ছি না! তা ছাড়া রেগুলার ব্যায়াম করি একবার বলেছি না!'

'বলেছেন। আমার মনে ছিল না।' বলে, মিজান এবার নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে নিনি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বলল, 'চলেন বাইরে কোথাও গিয়ে আগে রেষ্ট নেই!'

বিল মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে মিজান জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়ে

বসবেন?'

'বসার জায়গার কি অভাব? জাদুঘরের কাছে বসতে পারি! তা ছাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও বাইরে অনেক বসার জায়গা আছে!'

মিজান বলল, 'আমার টিউশানিতে যাওয়া হল না!'

'একদিন না গেলে এমন কোনো ক্ষতি হবে না!'

'আমার ক্ষতি না হল, কিন্তু ছাত্রটার তো ক্ষতি হয়ে গেল!'

'তারও হবে না!'

মিজান নিনির সাথে পেরে না ওঠাতে মাথা নাড়লো অসহায় ভঙ্গিতে।

পাবলিক লাইব্রেরির সীমানায় ঢুকে ওরা তেমন ভাল জায়গা পেলো না। শেষটায় সিঁড়ির একটা ধাপে গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়লো। সে সময় দুটো ছেলে নিনির দিকে হাত নেড়ে বলল, 'হাই!'

নিনিও একই কায়দায় প্রতি উত্তর জানায়।

মিজান অবাক হয়ে তাকায়।

তারপর জিজ্ঞেস করে, 'চেনেন নাকি ওদের?'

'আরে না!'

এক হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে নিনি।

'এখানেও লাফাঙ্গা পোলাপান!'

'ওরা কোথায় নেই?'

পাল্টা প্রশ্ন করে নিনি।

মিজান বলল, 'বাদ দিন তো! আপনার কিন্তু বাসায় ফিরে যাবার কথা ছিল। একটা ফোনও করতে পারতেন!'

নিনি বলল, 'অনেক দিন পর বাইরে বেরিয়েছি। ভাল লাগছে। এটা নষ্ট করে দেবেন না! পি-জ!'

মিজান নিঃশব্দে মাথা দোলায়।

'আপনাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করব?' মাথা কাত করে তাকায় নিনি।

'কি কথা?'

'টিউশানি ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না?'

মিজান হেসে বলল, 'না! কেবল এই কাজটাই ভাল পারি!'

তার মনে হল, টুসির কথাই যেন নিনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

'অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না?'

'এখন থেকে ভাবতে হবে দেখছি!'

'না ভাবলে চলবে? বিয়ে করেছিলেন বলেছিলেন। তার মানে এখন সিঙ্গেল!'

মিজান বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করে না। বলে, 'খুব বেশি ব্যক্তিগত হয়ে গেল!'

নিনি বলল, 'আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা কি অফিসিয়াল ছিল?'

মিজান বুঝতে পারলো নিনিকে হটানো যাবে না। বলল, 'সেটা হচ্ছে আমার ব্যর্থতা। আমাকে বিয়ে করে তার প্রত্যাশা পুরণ হয়নি বলে মাস ছয়েকের মাথায়ই ছেড়ে গেল!'

'বিয়েটা কি স্যাটেলড? না..!'

'আমারই এক ছাত্রী। বিয়েটা দুজনের ইচ্ছেতেই কোর্টে গিয়ে হয়েছিল। জোরটা অবশ্য ওর দিক থেকেই ছিল বেশি। এমন যে হবে সেটা ভাবতে পারিনি!'

'নিঃসঙ্গ আছেন কত দিন হল?'

'এই তো ছ'বছর হয়ে গেল!'

নিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠে।

মিজান বিস্মিত হয়ে বলে, 'এটা হাসির কথা হল?'

হাসির দমক সামলে নিনি বলল, 'সরি! একটা কথা মনে হতেই হাসি চাপতে পারলাম না!'

মিজান তার বিরক্তি গোপন করে না, 'এমন করলে তো আপনার সাথে আর থাকা যাবে না! আপনার হাসি পাচ্ছে কেন?'

'মাইন্ড করবেন না তো?

মিজান ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

নিনি বলল, 'এই ছ'বছরে চরিত্রটা তাহলে গেছে!'

এবার মিজানও শব্দ করে হেসে ওঠে।

তারপর বলে, 'আমি তো ইট-পাথর না!'

'খুব ভাল! সাহস আছে বটে!'

'সাহসের কি আছে? আমি না বললে কোন যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন?'

'তা অবশ্য বিশ্বাস করতাম না! তবে অন্যটা ভাবতাম!'

নিনি আবার মুখে হাত চাপা দেয়। তবে এবার শব্দ করে হাসে না।

নিনির কথায় কোনো খারাপ কিছু ভাবতে ইচ্ছে হল না মিজানের। কারণ মনের ভেতর গন্ডগোল রেখে এমন উদ্ভট প্রশ্ন কোনো মেয়ে কোনো

অপরিচিত পুরুষকে করতে পারে না। এমন কি বন্ধু হলেও করাটা উচিত হবে না।

তারপর সে আবার ভাবল, বাংলাদেশের বাইরে থেকেছে বলেই হয়ত সংকোচ মুক্ত হতে পেরেছে মেয়েটা। তবে একটু বেশিই যেন সংকোচ মুক্ত !

'কিছু ভাবছেন?'

'না! তেমন কিছু না!'

'চলেন উঠি! আজ আপনার অনেক ক্ষতি করেওলাম! তবে স্বীকার করছি, মানুষ হিসেবে আপনি চমৎকার!'

মিজান বলল, 'আপনিও কেবল ইচ্ছে করলেই আরো চমৎকার হয়ে উঠতে পারেন!'

'আপনি যদি বলেন তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করব!'

'এ জন্যেও কি অনুপ্রেরণা লাগে?'

নিনি বলল, 'লাগে! লাগে! কোনো কিছু হয়ে ওঠার পেছনে যা থাকে তা কেবল অনুপ্রেরণাই!'

টনির অবস্থা এখন ভাল। আগামী কাল থেকে আবার লেখাপড়া শুরু করতে পারবে।

তিন্নির সাথে কথা বলে বিদায় নিতেই আরো ঘন্টা খানেক সময় পেরিয়ে যায়। আজ আর কোনো টিউশানি নেই মিজানের। তাই সে এই দীর্ঘ সময় কিভাবে কাটাবে ভেবে পায় না। একবার মনে হয় টুসির ওখানে যাওয়া যায়। কিন্তু আজ টুসির সাথে দেখা করতে চাচ্ছে না। কিছু দিন না পেরোলে এত শিঘ্রি দেখা করতে গেলে টুসির কাছে তার ওয়েট কমে যেতে পারে। সে বাস স্ট্যান্ডের কাছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে অঞ্জলির কথা। কেমন আছে অঞ্জলি? অনেক দিন সেদিকে যাওয়া হয় না। নিশ্চয়ই এতদিনে মেয়েটা তাকে স্বার্থপর ভাবতে শুরু করেছে। একটা চৌদ্দ নাম্বার বাস এসে থামতেই মিজান উঠে পড়লো।

বাসের পেছনের দিকে বসে ছিল মিজান। কিন্তু বাঙলা কলেজের সামনে ভাঙ্গা-চোরা এবরো-থেবড়ো রাস্তাওঁয়ে যাবার সময় ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে তার শরীরের জয়েন্টগুলো আলগা হয়ে যাবার অবস্থা হল। শেষে টিকতে না পেরে উঠে সে সামনের দিকে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো। লোকজন উঠা-নামার সময় তাকে বার বার এদিক সেদিক সরতে হচ্ছিলো বলে সে

ড্রাইভারের পেছনের দিকের লম্বা সিটটাতে বসে পড়ে। লক্কর-ঝক্কর মার্কা বাস। যেন হাঁপানি রোগী দম টানতে টানতে এগিয়ে যাচ্ছে।

দশ নাম্বার গোল চক্করের কাছে সে নেমে যায়।

তারপর একটা রিকশায় উঠে বসে। রিকশাঅলাকে রূপনগর যেতে বলে। এর আগের বার এসেও এ আংশটা তার পছন্দ হয়নি। চারদিক কেমন নোংরা নোংরা মনে হয়। তবুও অঞ্জলির জন্যেই তাকে বারবার এখানেই আসতে হয়। কোনদিন তার মনে হয়নি যে আজ আসবে না। ইচ্ছে হওয়া মাত্রই কেমন যেন সে কখনো নিজের অজান্তেই চলে এসে অবাক হয়েছে।

রিকশা থেকে নেমে গ্রামের মত এলাকাটা তার ভাল লাগে। সরু একটা রাস্তা ধরে সে এগিয়ে যায়।

লোহার বন্ধ গেটে টোকা দিতেই কিছুক্ষণ পর দরজা খোলে কেউ। মিজান ভেতরে ঢুকতেই অঞ্জলির মেয়ে সৃষ্টিকে দেখতে পায়।

তাকে দেখে মেয়েটা যেন উল-াসে ফেটে পড়ে। 'আম্মু! দেখে যাও! চাচু এসেছে!'

অঞ্জলি মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাসি মুখে দরজায় এসে দাঁড়ায়।

সৃষ্টিকে কোলে করে গেট বন্ধ করে দিয়ে মিজান এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছেন?'

অঞ্জলি বলল, 'ভাল! এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো?'

মিজান অঞ্জলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'দুটো মাস কি খুব বেশিদিন হয়ে গেল?'

'আপনার কি মনে হয়?'

মিজান ইতস্তত করে।

অঞ্জলি বলল, 'ভেতরে আসেন!'

মিজান দরজার সামনে সৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। সে সব দিক চোখ বুলিয়ে দেখে। ঘরটা আগের বার যেমন শ্রী হীন দেখে গিয়েছিল আজো তেমনি রয়ে গেছে। কোনো পরিবর্তন নেই।

তবে একটা পরিবর্তন তার চোখে পড়লো। সেটা হচ্ছে ঘরের কোণার দিকে একটা সতের ইঞ্চি ফিলিপস সাদাকালো টিভি ছিল। নেই। সেখানে একটা বেতের চেয়ার বসিয়ে ফাঁকা জায়গাটা আড়াল করা হয়েছে।

সৃষ্টি কাছে এগিয়ে আসতেই মিজান তাকে কোলের কাছে টেনে নেয়। বলে, 'মা মনি! তোমার খবর বল! স্কুলে ভর্তি হয়েছ?'

হয়েছি! আম্মু নিয়ে গেছিল!'

'খুব ভাল! তো লেখা-পড়া কেমন হচ্ছে?'

সৃষ্টি এবার কিছু না বলে মুখে আঙ্গুল পুরে রাখে।

মিজান তাকে দু হাতে জড়িয়ে আলতো ঝাঁকি দিয়ে বলে, কি? বলছ না যে!'

কানের কাছে মুখ এনে মেয়েটা বলল, 'বই খাতা-কেনা হয়নি। টিভিটা দোকানে দিয়ে রেখেছে। আম্মু বলেছে বিক্রি হলে বই-খাতা কিনে দেবে!'

অঞ্জলি ভেতর থেকে ডাকলো, 'সৃষ্টি!'

সৃষ্টি বলল, 'আম্মুকে এসব কথা বলবে না কিন্তু!'

'আচ্ছা!'

সৃষ্টি দৌঁড়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর অঞ্জলি চা-বিস্কুট নিয়ে এলো।

মিজান বলল, 'আবার এসব কেন?'

'বেশি কি? শুধু চা-বিস্কিটই তো!'

একটা বিস্কিট হাতে নিয়ে মিজান জিজ্ঞেস করে, 'তো আপনার দিন চলছে কিভাবে?'

'এই চলে যাচ্ছে!'

মিজান খেয়াল করল যে, অঞ্জলির দুহাত নিরাভরণ। আগের বার দুহাতে দুটো সোনার বালা ছিল। সে ভাবল, তাহলে কি ওগুলো সে বেচে দিয়েছে?

এটাই তার মনে হল। কারণ, অঞ্জলির স্বামী রশিদ আর সে একই ইয়ারে পাশ করে বেরিয়েছিল। চাকরি নামের সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে দু বন্ধুই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল টিউশানিকেই। রশিদ টাকা জমিয়ে এই জায়গাটা কিনে দু কামরার বাড়ি বানিয়ে নিয়েছিল। চলে যেত ভালই। তার স্বপ্ন ছিল কিছুদিন পর সুযোগ সুবিধা মত পাশের খালি জায়গাটায় ব্যাংক-লোন আর জমানো টাকা মিলিয়ে দু ইউনিটের একটা বিল্ডিং করবে। কিন্তু তার ভেতরে যে কাল-রোগ বাসা বেঁধেছিল কেই বা জানতে পেরেছিল! সে নিজেও কি জানতে পেরেছিল? দিনরাত এত কষ্ট আর খাটা-খাটুনির পরও তার হাই ব-ডপ্রেসার হয়ে গেছিল। জয়েন্ট একাউন্ট নিয়ে একদিন অঞ্জলির সাথে রাগারাগি করে জ্ঞান হারাল। কোমা অবস্থায় রইলো একমাস। সে অবস্থা থেকে আর ফিরে এলো না রশিদ। আর সেই একমাসে ইনটেনসিভ কেয়ারের খরচ আর ইন্ডিয়ায় ছুটোছুটি করে নিঃস্ব হয়ে গেল অঞ্জলি। তারপর যে ক'টা টাকা ছিল তাতে হয়ত এ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। যার ফলে ওই দু

গাছা বালার মায়াও কাটাতে হয়েছে চিরতরে।

'মেয়েকে ভর্তি করিয়েছেন?'

'করিয়েছি!'

'কোন ক্লাস যেন?'

'ক্লাস থ্রিতে!'

মিজান চা খেতে খেতে ইচ্ছে করেই এদিক ওদিক তাকায়।

তারপর কোনের দিকটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে একটা টিভি ছিল না? ওখানেই তো ভাল ছিল! সরালেন কেন?'

'দোকানে দিয়েছি!'

'কোন দোকানে? নষ্ট হয়ে গেছিল? কি নষ্ট হয়েছে? মেমোটা কি আছে?'

অঞ্জলি চোখের পানি আর ঠেকাতে পারল না। মাথা নিচু করে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরতেই চোখের পানিগুলো টপটপ করে তার কোলের উপর পড়তে লাগল।

মিজান কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে সব বলতে পারেন! কোনো সঙ্কোচ করবেন না!'

অঞ্জলি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না চাপতে চাপতে বলল, 'কি বলব! আপনি বুঝতে পারেন না? মানুষটা নিজে চলে গিয়ে আমাকে যে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেল!'

'পি-জ! আপনি কাঁদবেন না। আপনি ভেঙে পড়লে আপনার মেয়েকে সামাল দেবে কে?'

'কে দেবে? আমার কে আছে আর?'

মিজান কিছু না বলে চুপ করে থাকল। অঞ্জলি এভাবে কিছুক্ষণ কাঁদুক! বুকের জমানো কষ্টগুলো মোমের মত গলেগলে বেরিয়ে যাক! বুকের ভার কিছুটা হলেও কমবে।

সৃষ্টি তার মায়ের কান্নার শব্দ পেয়েই ছুটে আসে।

তারপর মিজানের দিকে তাকিয়ে বলল, আম্মু কাঁদছে কেন চাচ্চু?'

সে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল।

অঞ্জলি চোখ মুছে মেয়েকে আদর করে বলল, 'কোই মা মনি? এই যে আমি হাসছি! একটুও কাঁদছি না তো!'

'তাহলে কান্নার মত শুনলাম যে!'

মিজান বলল, 'তুমি আমার কাছে এস। তোমার মা কান্নার মত করে

কথা বলেছিল তো! তাই তোমার অমন মনে হয়েছে!'

সৃষ্টি কেমন প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে থাকল মিজানের মুখের দিকে।

'তোমার ক্লাস আরম্ভ হবে কবে যেন?'

'নেকস্ট উইকে!'

'বুকলেট দেয়নি?'

'দিয়েছে তো!'

'আমাকে দেখাতে ভুলে গেছ!'

সৃষ্টি বলল, 'ওটা আম্মু রেখেছে!'

মিজানের দিকে ভেজা চোখ তুলে তাকাল অঞ্জলি। কিন্তু কিছু না বলেই উঠে গেল।

সৃষ্টি বলল, 'খাতাগুলো ইস্কুল থেকে কিনতে হবে।'

'কেন মা মনি? বাইরের খাতায় হবে না?'

'ওগুলোতে কি আমাদের ইস্কুলের নাম আছে?'

মিজান বলল, 'তাই তো! ওটা তো ভেবে দেখিনি!'

'ই-ই-ই! তুমি কি বোকা!'

মিজান তার মুখটাকে ব্যাজার করে বলল, 'পি-জ মা মনি! আম্মুর সামনে আমাকে বোকা বোলো না কিন্তু! তাহলে খুব লজ্জা পাব!'

সৃষ্টি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে।

কিছুক্ষণ পর অঞ্জলি হাতে করে একটা হলদে কাগজ নিয়ে ফিরে আসে।

তারপর মিজানের সামনে টি-টেবিলের ওপর রেখে আগের জায়গায় ফিরে যায়।

মিজান কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে সেটা দেখে। নিচের দিকে নিউমার্কেটের একটা দোকানের নাম দিয়ে বলা হয়েছে বই-খাতার পুরো সেট এক সাথে পাওয়া যাবে। সে অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল, এটা আমার কাছে থাক। কাল-পরশু আসবার সময় সবই নিয়ে আসব।

অঞ্জলির চোখ আবার পানিতে টলমল করে উঠল। ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি আটকাল বোধ হয়। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়। কান্নার বেগের সাথে বলে উঠে, 'আমরা ভিক্ষের কপাল নিয়ে জন্মে ছিলাম!'

মিজান আহত কণ্ঠে বলে, 'ছি! নিজেদের অত অসহায় ভাবছেন কেন? আমি কি খুব বেশি দুরের মানুষ? আপনাদের জন্যে কি কিছুই করতে পারি না?'

অঞ্জলি নাক টেনে বলল, 'ও থাকলে কি আপনি এসব করতে

পারতেন?'

'আশ্চর্য! আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিমতি একটা মেয়ে হয়ে অমন বোকার মত কথা বলছেন কেন? টেক ইট ইজি!'

অঞ্জলি তার পানি ভারাক্রান্ত চোখ দুটো তুলে মিজানের দিকে একবার তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে বলল, 'কত দিন এভাবে নিজেদের ছোটো করব?'

'রশিদ কি বলেনি আমার কাছে সংকোচ না করতে? ওকে তো কথা দিয়েছি আমার সাধ্য মত আপনাদের জন্যে করব!'

তারপর আবার বলল, 'আমাকে দায়িত্বহীন হতে বলবেন না! পি-জ!'

সৃষ্টি গিয়ে তার মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়াল।

মিজান বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে! আমি আজ যাই!'

সৃষ্টি আবার মিজানের কাছে এসে বলে, 'আবার কবে আসবে চাচ্চু?'

মিজান অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে দেখল, সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

তারপর সৃষ্টিকে কোলে তুলে আদর করে বলল, 'কালকেই আবার আসব মা মনি!'

মিজান বলল, 'এ সময় আপনার বোন-টোন কাছের কোনো আত্মীয়কে এনে রাখতে পারতেন!'

অঞ্জলি বলল, 'ধর্ম পাল্টালে জাত, সমাজ আর পরিবার সবই পাল্টাতে হয়!'

'ও। আচ্ছা, আজ আসি! ভাল থাকবেন!'

মিজান গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেক আগেই।

চার

সকাল বেলা নাস্তা করবার জন্যে বের হয়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখেই পেপার স্ট্যান্ডে দাঁড়ায় মিজান। এটা তার প্রতিদিনকার অভ্যেস।দ্রুত শিরোনামগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যায়। কখনোই খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছে হয় না।

আজও সাজিয়ে রাখা দৈনিক পত্রিকাগুলোর উপর চোখ পড়তেই সে বিস্ময়ে হা হয়ে যায়। সবগুলো পত্রিকাতেই হেডিং এসেছে যে, কমিউনিস্ট

পার্টির সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ। হতাহতের সংখ্যাটা একেক কাগজে একেক রকম এসেছে। তার মন খারাপ হয়ে যায়। এসব কী আরম্ভ হল দেশটাতে? কত দুর-দুরান্ত থেকে পার্টিভক্ত লোকগুলো এখানে এসে জড়ো হয়েছে! আর এখানেই কিনা বোমা ফাটল? কারা করে এসব? এসব করে অনর্থক মানুষ মেরে কী লাভ হয় তাদের? তারা কি একবারও ভেবে দেখে না যে, এখানে এমন কেউকেউ থাকতে পারে যে তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি! তার মৃত্যুতে পুরো পরিবারটার কি করুণ হাল হতে পারে, ওরা কি একবার ভেবে দেখে না? কি হয় এমন নোংরা খুন-হত্যার বিভৎস রাজনীতি না করলে?

খেতে বসে তার মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়। গলা দিয়ে খাবার নামতে চায় না। তবু সে জোর করে গিলবার চেষ্টা করে। কিন্তু বমির বেগ উঠে আসতেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

ফেরদৌস নামের বেয়ারাটা আজ আসেনি। যে ছেলেটা চা নিয়ে এল, তাকে মিজান জিজ্ঞেস করে, 'ফেরদৌস কোথায় রে? আজ ওর ডিউটি নেই নাকি?'

ছেলেটা চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনে কিছু হোনেন নাই ছার?'

মিজান অবাক হয়ে বলে, 'কি হয়েছে?'

ছেলেটা একটু ঝুঁকে বলল, 'হ্যায় তো কাইল রাইতে টিক্কা হারুনের লগে ফাইট দিতে গিয়া গুলি- খাইছে! অহন মেডিকেলে আছে! হুনছি একটা হাত কাইট্যা ফালাইতে হইবো!'

'ও ফাইট দিতে গেল কেন?'

'টিক্কা হ্যাগো বস্তি দখল করতে গেছিল! টিক্কা আর টিক্কার দল হেভি পিডানি খাইছে ছার! টিক্কারে তো পিডাইয়াই মাইরাই ফালাইছে!'

মিজানের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, সে তখন মরিয়া হয়ে ওঠে। সারা দেশ যদি এমন মরিয়া হয়ে ওঠে আর মাস্তান সন্ত্রাসীদের ধরেধরে প্যাঁদানি দেয়, তাহলে তো দেশটায় লাশের গন্ধে থাকা যাবে না! এম্নিতেই চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রক্ত আর বারুদের গন্ধ! অসহায় মিজান ভাবে, এ দেশটার কি রক্তের পিপাসা একাত্তরে মেটেনি? আর কত রক্ত খাবে এই বাংলাদেশ?

তারপর আবার ভাবে, এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে! টিক্কা হারুনদের মত লোকেরা এ দেশের জঞ্জাল! জঞ্জাল যত কমে ততই দেশের পরিবেশ সুস্থ

হয়ে উঠতে থাকবে।

নাস্তা খেয়ে ঘরে ঢুকবার মুখেই বাড়িওয়ালার আতঙ্কিত চেহারার মুখোমুখি হয় সে। সালাম দিতেই তিনি বললেন, 'কাজটা কি ঠিক হল?'

মিজান বলল, 'কোন কাজটা?'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কিছুই জানেন না?'

'আপনি না বললে কি করে বুঝব?'

প্রায় ফিসফিস করে বললেন,'টিক্কাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়েই দিলেন?'

'কী বলছেন এসব! বিস্মিত মিজান আৎকে ওঠে।'

'স্বীকার করবেন না বুঝতে পারছি! হাই লেভেলে হাত আছে তাহলে?'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'যাক বাবা! আপনি আমার বাড়িতেই আছেন বলে খুব ভরসা পাচ্ছি! আর কেউ আমার বাড়ির দিকে চোখ তুলেও তাকাতে সাহস পাবে না! আমি আসি! পরে আলাপ হবে! কেমন?'

তারপর মিজানকে সালাম দিয়ে লোকটা কেমন কাঁপাকাঁপা পায়ে বেরিয়ে গেল। আর সাথে সাথেই দেখতে পেল অন্যান্য বোর্ডাররা বেশ ভয়েভয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। ব্যাপারটা দেখে তার নিজেরই খুব অস্বস্তি হতে লাগল। আজ বেলা দুটোর আগে তার কোনো টিউশানি নেই বলে রুমেই থাকার কথা ভেবেছিল। কিন্তু তার প্রতি অন্যদের মনোভাব দেখে সে এখনই বেরিয়ে যাবার মনস্ত করে।

হঠাৎ করেই সৃষ্টির বুকলেটের কথা মনে পড়ে তার। আর সাথে সাথেই সে চেক বইটা বিছানার তলা থেকে বের করে প্যান্টের পকেটে রাখে। তারপর যথা সম্ভব দ্রু তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

হেঁটে হেঁটেই সে ব্যাঙ্কে পৌঁছে যায়।

পকেট থেকে চেকবইটা বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে টাকার অংক লিখতে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর দশ হাজার টাকা নিয়ে সে প্যান্টের ভেতরে পেটের কাছে আটহাজার টাকা রাখে। ওয়ালেটে রাখে দুহাজার।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সে একটা অটো নিয়ে সোজা নিউমার্কেটে যায়। প্রথমেই বই-খাতাগুলো কেনে। সাথে আরো নানা টুকিটাকি ফল-মুল নিয়ে এবার হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে এসে বাসে চড়ে। রিকশা নিয়ে অঞ্জলির বাড়িতে পৌঁছতে খুব একটা দেরি হয় না মিজানের।

হাতের প্যাকেট টি-টেবিলের ওপর রাখতেই সৃষ্টি প্রায় হামলে পড়ে।

প্যাকেট খুলে বই-খাতা সব এক সাথে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে, আম্মু! আম্মু! আমার সব বই খাতা দেখে যাও!'

অঞ্জলি ঘরে ঢোকে না। দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ মোছে।

মিজানের কাছে সৃষ্টির আনন্দটা স্বর্গীয় বলে মনে হয়। সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিতে সে ফলের প্যাকেটা খুলে দেখায়।

মেয়েটা চোখ বড়বড় করে বলে, 'চাচ্চু! এগুলো সব আমার জন্য?'

'হ্যাঁ মামনি!'

অঞ্জলি কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে থাকে মিজানের দিকে। তার অস্বস্তি শুরু হয়। বলে, 'সকাল সকাল এসে মন খারাপ করে দিলাম?'

অঞ্জলি তবুও চুপ করে থাকে।

মিজান বলল, 'আরে ভাই! আমি তো আপনার মেয়েকে পটিয়ে-পাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না! অমন ভাবে তাকিয়ে থাকলে আমার খারাপ লাগবে!'

'খারাপ লাগলে কি করব?'

'আমি কখনো বাজার করিনি। তাই ব্যাপারটা আমি বুঝি না! আজ দুপুরে যদি আপনাদের সাথে খেতে চাই হেল্প করবেন তো?'

নির্বিকার ভাবে অঞ্জলি বলল, 'কেমন হেল্প চান?'

'বাজার করতে অর্থাৎ একটা সংসারে খাওয়ার জন্যে কি কি লাগে সেটার যদি একটা লিস্ট দেন!

'আপনার কি মাথা খারাপ হল? এতকিছু কেন করবেন আপনি? আমরা আপনার কে?'

'কে না?' বলে, ভ্রু নাচায় মিজান।

তারপর আবার বলে, 'আপনার তো সৃষ্টি আছে কিন্তু আমার কে আছে? কারো জন্যে কিছু করতে আমারও তো ইচ্ছে হয়! নাকি যার কেউ নেই তার কিছুই করতে নেই?'

মিজানের মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে।

'সরি! মিজান ভাই!' অঞ্জলি কথা বলে ওঠে। 'আমি আসলে তা মিন করিনি! ওর জন্যে আপনার এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল! আবার আমাদের জন্যে এত খরচ করেও আরো করতে চাচ্ছেন! আমরা মা-মেয়ের তো এত ঋণের বোঝা টানবার ক্ষমতা নেই!'

'দশ বছর ধরে ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছি। একদিন যদি রশিদের মত টুক করে চলে যাই, সেই টাকা কে খাবে?'

অঞ্জলি হঠাৎ ছুটে এসে মিজানের মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, 'পি-জ!

অমন কথা বলবেন না!'

তারপর চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, 'অন্তত মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি অমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না! বাচ্চা মেয়েটা আপনার আদরে পিতৃশোক তো কাটিয়ে উঠতে পারছে!'

মিজানের কি হল। মনে হল বুকের ভেতরটা কেমন গুড়োগুড়ো হয়ে যাচ্ছে। একটা কষ্টের ঢেউ হৃদপিন্ডের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে উঠে গলা অবধি এসে থেমে রইল কিছুক্ষণ। জায়গাটা কেমন ব্যথা-ব্যথা করতে লাগল। জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রশিদের মৃত্যুতেও তার চোখ দিয়ে পানি আসেনি এক বিন্দু। অথচ অঞ্জলির এই অল্প ক'টি কথায় তার চোখ দিয়ে কখন পানি বেরিয়ে এসেছে টের পায়নি।

সৃষ্টি আপেলের খোসা ফেলে উপরে তাকাতেই দেখল মিজানের চোখে পানি। বলল, 'চাচু! তুমিও কাঁদছ?'

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায় মিজান। দ্রুত চোখ মুছে বলল, 'কোই কাঁদছি! এম্নিই পানি বেরিয়ে এসেছে!'

'তোমার কি চোখ খারাপ?'

'হ্যাঁ মা মনি! আমার চোখ অনেক খারাপ হয়ে গেছে!'

সে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অঞ্জলিকে তাড়া দিয়ে বলল, 'কোই লিস্টটা দিলেন না!'

কিন্তু অঞ্জলি আবার সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

মিজান সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'যদ্দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছেন তদ্দিন আমি পাশে আছি!'

এবার যেন ব্যাপারটা কিছু সহজ হয় অঞ্জলির জন্যে। বলল, 'চা-টা কিছুই দিতে পারছি না বলে খারাপ লাগছে!'

'নেভার মাইন্ড! লিভ ইট!'

অঞ্জলি উঠে যেতেই মিজান সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করল, 'মা মনি! তুমি কি বলতে পারবে তোমাদের টিভিটা কোন দোকানে দিয়েছে?'

'রাস্তার কাছে। কোইনুর নামের একটা দোকান আছে!'

'তোমাদের চেনে?'

সৃষ্টি মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ! বাদল নানার বাসায় আগে কত্ত গেছি!'

অঞ্জলি ছোট্ট একটা লিস্ট বানিয়ে নিয়ে এল। ওতে কেবল তরি-তরকারির নামই আছে। চাল-ডাল-আটা-চিনি এসবের নাম নেই।

মিজান লিস্টটা হাতে নিয়ে পকেটে পুরল। উঠতে উঠতে বলল,

দআজকের বাজার ভাল না হলে, এর পর আপনিও সঙ্গে যেতে হবে!'

অঞ্জলি কিছু বলল না।

মিজান বেরিয়ে এসে রাস্তার শেষে অর্থাৎ মেইন রোডের পাশেই কোহিনুর নামের দোকানটা দেখতে পেল। সেখানে কিশোর বয়সের একটা ছেলে বসে আছে। সে দোকানের সামনে গিয়ে একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। ছেলেটা মাথা তুলতেই জিজ্ঞেস করে, 'বাদল সাহেব কি নেই? আপনার কে হন উনি?'

'আমার বাবা!' ছেলেটা বলল। 'উনি যোহরের পরে আসবেন!'

'ও! আচ্ছা, সৃষ্টি-অঞ্জলি ওদের চেনো নাকি?'

'চিনি তো! রশিদ ভাই মারা গেল, ওর ওয়াইফ অঞ্জলি আপা!'

'টিভিটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?'

'না। বিক্রি হয়নি!'

'ঠিকঠাক ছিল তো? নাকি নষ্ট-টষ্ট হয়ে গেছিল?'

'না না! এখনো কত ফাইন পিকচার আসে!'

'ওটা ওদের বাসায় ফেরত দিয়ে আসতে পারবে?'

'এখন পারব না। বাবা এলে দিয়ে আসব!'

মিজান দশটা টাকা বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, 'রিকশায় করে নিও। আর অঞ্জলিকে বলবে যে, বিক্রি হয়নি! নাকি এ মিথ্যেটা বলা যাবে না?'

ছেলেটা দশটাকার নোটটা পকেটে পুরে বলল, 'ঠিক আছে! কিন্তু আপনি কে?'

'সৃষ্টির চাচা!'

'ও! আপনিই মিজান ভাই!'

'আমার কথা শুনলে কোথায়?'

'সৃষ্টির কাছ থেকে।'

মিজান বলল, 'গুড! আমি বাজারে যাব! আচ্ছা সৃষ্টির স্কুলটা কোন দিকে বলবে?'

সে হাত তুলে রাস্তার ওপারে দেখিয়ে দিল।

মিজান যেতে যেতে বলল, 'গুড বয়! দেখা হবে!'

রাস্তাটা পেরিয়ে সে স্কুলটার গেটে এসে দাঁড়াল। দারোয়ান বলল, 'কাকে চান?'

'ভেতরে যাব! ভর্তির ব্যাপারে!'

দারোয়ান গেটটা ফাঁক করে দিয়ে বলল, 'যান। অফিসে চলে যান!'

মিজান অফিসে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবে এমন কাউকে দেখল না। একটা দরজার মাথায় প্রিন্সিপ্যাল লেখা রুমটার দিকে যায় সে। ঝোলানো পর্দার ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিয়ে বলল, 'আসতে পারি?'

'আসুন।' বলে, প্রিন্সিপ্যাল মাথা তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মিজানও অবাক হয়ে গেল। বলল, 'আপনি?'

'মাস্টার সাহেব! বাসা থেকে থেকে এসেছেন? আমার বাসার খবর কি?'

মিজান হেসে বলল, 'ঘাবড়াবেন না! আপনার বাসায় যাইনি! তিনটার দিকে যাব!'

'তাহলে কি মনে করে?'

'আসলে আমি জানি না আপনি এখানে। এসেছিলাম একটা খোঁজ নিতে!'

'কি ব্যাপারে, বলেন তো?'

'ক্লাস থ্রিতে একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে। নাম সৃষ্টি।'

'হ্যাঁ। ওর মায়ের নাম অঞ্জলি আর বাবার নাম ...।'

'রশিদ।' নামটা ধরিয়ে দেয় মিজান।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। রশিদ! তা বলেন!'

'শুনেছি, স্কুল ড্রেস নাকি এখান থেকেই নিতে হয়?'

'হ্যাঁ। আমরা তো বাচ্চাদের ভর্তির সময়ই কথাটা জানিয়ে দেই।'

মিজান বলল, 'ভর্তির সময় টাকাটা নিয়ে নিলেই ভাল হত না?'

'না না! ভর্তির তিন মাসের মধ্যেই ড্রেস হলে চলে! আর ভর্তির সময় এটা নিলে অনেকের জন্যে প্রবলেম হতে পারে!'

'আরেকটা কথা আপা, আমি চাচ্ছিলাম মেয়েটার পুরো বছরের বেতন-ফিস একবারেই দিয়ে দিতে!'

'কেন? একবারে নেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না!'

মিজান বলল, 'দেখুন আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই। রশিদ আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। ওর বউ অঞ্জলি কোত্থেকে মাসেমাসে বেতন দেবে! তাই গোপনে ওটা আমিই ক্লিয়ার করে ফেলতে চাই!'

'এই যে অঞ্জলির কথা বললেন, ও কোনো চাকরি নিচ্ছে না কেন?'

'চাকরি নিলে মেয়েকে দেখবে কে?'

'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'ওর সাথে কেউ সম্পর্ক রাখেনি। আরেক ধর্ম থেকে এসেছে তো! যার ফলে দুদিকের আপন জনদেরই হারাতে হয়েছে!'

'ভ্যারি স্যাড! আমরা শিক্ষিত হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ঠিক ঠিক মানুষ হতে পারছি না!'

তারপর আবার বললেন, 'মেয়েটার লেখা-পড়া কদ্দুর?'

'ইংরেজিতে অনার্স করছিল। কিন্তু সৃষ্টির জন্মের কারণে পরীক্ষা ভাল হয়নি। পাস ডিগ্রি পেয়েছে!'

'তাহলে তো ভালই! কিছুদিন পর ইংরেজির জন্যে একজন টিচার নেব ভাবছিলাম। সে যদি চাকরি করতে চায় তাহলে পেপারে আর এ্যাড দেব না। কমিটির বোর্ডেই সিলেকশন দিয়ে দেব! আপনি আগে কথা বলেন! মা-মেয়ে এক সাথে আসবে যাবে। কি বলেন?'

'তা তো অবশ্যই!'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'মানবিক কারণে আপনার কথা বিবেচনা করে পুরো বছরের টাকাটা নিয়ে নিচ্ছি! হয়ত ভাবতে পারেন টিচারের ছেলে-মেয়ের ফ্রি হওয়া উচিত! কিন্তু আমাদের রুলে এটা রাখিনি!'

তারপর তিনি বেল বাজালেন। একজন আয়া এসে বলল, 'জ্বে আফা!'

'জুলেখাকে আসতে বল!'

'আইচ্ছা আফা!'

'এক কাপ চা খান!'

'থ্যাঙ্ক্যু আপা! চা খাব না!'

জুলেখা নামের ভদ্রমহিলা এসে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মিজানকে বললেন, 'আঠারো-শ টাকা দিন!'

মিজান পেটের কাছ থেকে চারটা পাঁচ-শ টাকার নোট বের করে তুলে ধরে। প্রায় ছোঁ-মেরে টাকাটা তার হাত থেকে নিয়ে জুলেখাকে দিলেন প্রিন্সিপ্যাল। বললেন, 'উম্মে সাদিয়া নামের মেয়েটাকে চেনো তো? ক্লাস থ্রিতে পড়ে।'

'জী! চিনি!'

'থ্রি-র খাতা দেখে তার নামে এগার মাসের বেতন পরীক্ষার ফিস আর ইউনিফর্ম বাবদ রেজিস্ট্রারে তুলে, আঠারো-শ টাকার রসিদ নিয়ে এসো!'

মিজান বলল, 'আপনি রোজ এত দুর আসেন?'

'রোজ আসি না। সপ্তাহে দু দিন। আরেকটা স্কুলে যাই তিনদিন! ওটা ধানমন্ডিতে!'

ভদ্রমহিলার কণ্ঠে যেন কিছুটা অহঙ্কার ফুঠে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, 'কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি?'

'বলেন!'

'প্রশ্নটা একান্ত ব্যাক্তিগতও হতে পারে! তাছাড়া আপনার তো প্রায় সবই জানি, তাই সেই সাহসে ভর করেই বলছি!'

'জিজ্ঞেস করেই দেখেন!'

'বন্ধুর স্ত্রী-সন্তানের জন্যে আপনার এত গরজ কেন? মানুষ তো সাধারণতঃ আরেকজনের বিপদের সময় কিছুটা দুরে থেকেই না পারতে দায়িত্ব পালন করে! আপনাকে দেখছি ব্যতিক্রম!'

মিজান হাসল। বলল, 'আপনি হলেও ঠিক এমনটাই করতেন।'

'কেন করতাম?'

'হাসপাতালে থাকার কারণে আপনার বড় মেয়েকে আর পড়াতেই পারিনি। বাধ্য হয়ে নতুন টিচার রাখলেন। নতুন টিচারের নামটা মনে আছে আপনার?'

'ওর নাম রশিদই ছিল মনে হয়!'

'মনে হয় না! ও-ই! সৃষ্টির বাবা! তখনো ও বিয়ে করেনি। অঞ্জলির সাথে এ্যাফেয়ার চলছে। সে সময় আমি কেবল দুটো টিউশানি করতাম! ওতে আমার পুরো মাসের খাওয়া-পরাটা চলত শুধু। তো এ্যাকসিডেন্টের পর আমি হাসপাতালে। তা-ও আবার হলিফ্যামিলির মত অমন অ্যাক্সপেনসিভ জায়গায়! কত খরচ আসে আপনিই বলেন?'

'খরচ তো আসবেই প্রচুর!'

'তাহলে পুরো দুমাস হাসপাতালে থেকেছি। প্রতিদিনের খরচ। ওষুধ-পাতির খরচ। আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ানো! সব মিলিয়ে বিরানব্বই হাজার টাকা খরচ করে ও! তাও কি জানতাম? একদিন ওর নোট বুকটা ভুল করে রুমে ফেলে যায়। তুলে রাখতে গিয়ে পাতা ওল্টাতেই দেখা গেল তারিখ অনুযায়ী কোন খাতে কত খরচ সবই লেখা আছে। ওর মাঝে ওর ব্যক্তিগত খরচও অবশ্য ছিল! আমি কেবল আমার পেছনে কেমন খরচ হল তা আলাদা কাগজে টুকে রাখলাম। আর নোটবুকটা এমন এক জায়গায় ফেললাম যাতে ও বুঝতে পারে ওটা আমার চোখে পড়েনি! পরদিন ও রুম থেকে বেরিয়ে

যেতেই আমি হিসেব নিয়ে বসলাম। যোগ করে দেখি এত টাকা! সে মুহূর্তে আমাকে মনে হয়েছিল একজন মৃত মানুষ!'

মিজানের কথার ফাঁকেই জুলেখা রসিদ নিয়ে আসে। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত আসা দু-শটাকা সহ সার্টের বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

জুলেখা ফিরে যেতেই তিনি আবার বললেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কি! অনেক করে ধরে বললাম, রশিদ ভাই, তোমার খরচ কেমন হল আমাকে একটু বল! কিন্তু রশিদ কখনোই বলেনি! তাই কৃতজ্ঞতাই বলেন আর ঋণই বলেন, রশিদের সঙ্গ ছাড়িনি! বিয়ে নিয়ে গন্ডগোল, কোর্ট, থানা-পুলিশ সবখানেই থেকেছি ছায়ার মত। বে-জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে, রশিদের পরিবার ওর সাথে সম্পর্ক বাদ দিয়ে দেয়! অঞ্জলিরও একই অবস্থা! আত্মীয় বলতে, স্বজন বলতে আমিই ছিলাম! এখনো আছি!'

আপনি নিঃসন্দেহে মহৎ! আমি আপনার সাথে আছি! ভাল কাজে ভাগ বসাতেও ভাল লাগে! আজকাল বেশির ভাগ মানুষই বন্ধুর ঋণ মনে রাখে না! পারলে বন্ধুর সবকিছু আত্মসাৎ করে নেয়! এমন কি পারলে বউটাকেও বিক্রি করে দেয়! এতই নিচে নেমে গেছি আমরা!'

মিজান উঠতে উঠতে বলল, 'আপা! একটা অনুরোধ থাকবে!'

'বলেন!'

'অঞ্জলিকে এসব কিছুতেই বলা যাবে না! এমনকি ভুল করে আভাসও দেয়া যাবে না!'

'তা তো অবশ্যই! ও থাকবে আমার সাব-অর্ডিনেট! কাছেই ভিড়তে দেব না!'

প্রিন্সিপ্যাল হাসলেন! খুবই সুন্দর! তাঁর মুখটা হাসিতে আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মিজান বলল, 'উড ইউ মাইন্ড? কোন দিন আপনাকে হাসতে দেখিনি! কিন্তু আপনি কি জানেন হাসিতে মুক্তো ঝরা কাকে বলে?'

'জানি জানি! থ্যাঙ্ক্যু! ওইটাই তো আমাকে ডুবিয়েছে!'

মিজানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তিনি পেছন থেকে বললেন, 'দামি জিনিস বেশি খরচ করতে নেই!'

মিজান একবার পেছন ফিরে হাসল শুধু।

সত্যি সত্যিই বাজার করতে জানে না মিজান।

দোকানদারকে বলল, 'ভাই আমি ভাল খারাপ বুঝি না! কখনো বাজার করিনি! দেখে শুনে দিন!'

এ কথা বলার পরও সে খেয়াল করে কোনো পচা জিনিস যাতে না আসে। সুযোগ পেলে দোকানদারের পাল-া থেকে নামিয়ে দেয়।

একটা নয়-দশ বছর বয়েসের বাচ্চা মেয়ে ঝাঁকা মাথায় এসে বলে, 'মিন্তি লাগবো সাব?'

'না লাগবে না! লাগলেও তুই পারবি না!'

'পারমু সাব!'

মিজানের খারাপ লাগে। বলে, 'অন্য কাজ করতে পারিস না?'

'পারি না যে!'

'পালিয়ে যাবি না তো?'

'আপনে টুকরিটা ধইরা রাইখ্যেন!'

মেয়েটার সরল স্বীকারোক্তি শুনে ভাল লাগে মিজানের।

আলু-পটল থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব ধরনের তরকারি আধা কেজি করে নেয়। এমন কি কাঁচা-মরিচ ধনেপাতা কিনতেও ভুল করে না সে।

তারপর মাংসের দোকানের কাছ দিয়ে যাবার সময় তার মনে হয় অঞ্জলি গরুর গোস্ত খেতে খুব ভালবাসে। রশিদের কাছ থেকে রান্নাটাও শিখেছে চমৎকার! মিজান ঠাট্টা করলে সে বলত, 'কেবল এই গোশ্ খাবার জন্যেই আমার জাতটাকে মেরে দিলাম!'

যাতে না ঠকতে হয় সে জন্যে সে সঙ্গের মেয়েটাকে বলে, 'কোনটা খেতে ভাল হবে রে?'

'ছিনার গোস্ত লন সাব! আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দেয়।

মিজান হেসে তাকাল বিক্রেতার দিকে।

লোকটা হেসে বলল, 'সারাদিন বাজারেই পইড়া থাকে। ওগো থাইকা ভালা চিনবার পারবেন না!'

গোস্ত নিয়ে মাছের খোঁজে এগোয় মিজান। মেয়েটাকে বলে, 'কি নাম রে তোর?'

'মমতাজ।'

'তো মমতাজ!' মিজান শুধায়।

'জ্বে সাব!'

'মাছ পাব কোথায়?'

'আরো সামনে যান!'

আরো এগিয়ে যেতেই মিজান মাছের খোঁজ পেয়ে যায়। একটা রুই মাছ দেখিয়ে বলল, 'এটা কি মাছ?'

দোকানি হাসে। বলে, 'চিনেন না? এইটা রুই মাছ!'

মমতাজ বলল, 'এইডা নিয়েন না। ইন্ডিয়ার মাছ! খাইতে সোয়াদ পাইবেন না! লগেরডা দেশি!'

মাছ বিক্রেতা হেসে মমতাজকে বলে, 'তুই এই সায়েবের মেনেজার অইছস নিকি?'

মমতাজ হেসে বলে, 'তোমার কইতে অইবো না!'

মিজান বলল, 'মমতাজ! এটা কত হতে পারে রে?'

'আশিট্যাকা কেজি দিলে লইয়েন!'

দোকানিকে মিজান বলে, 'ঠিক আছে?'

'মাইয়া দর-দামও সব জানে! হেবি চালাক!'

মাছটার ওজন চার কেজি হয়। দাম পরিশোধ করে মিজান বলল, 'চল মমতাজ! বেরোই!'

মমতাজ আগে আগে হাঁটে আর মিজান থাকে ওর পিছু পিছু। বলে, 'চাল-ডাল তো তুই নিতে পারবি না! আরেকজন লাগবে! কি বলিস?'

মমতাজ খুশি হয়ে বলল, 'তাইলে তো ভালাই অয়! আমার কষ্ট কমে!'

চাল-ডাল, তেল-নুন, চা-চিনি, গুড়ো দুধ সব আরেক কিশোরের মাথায় চাপিয়ে মিজান অঞ্জলির বাড়ির দিকে হাঁটে।

গেটের কাছে এসে টোকা দেয় সে। ভেতর থেকে সৃষ্টি চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

মিজান বাইরে থেকে বলল, 'চাচ্চু!'

সৃষ্টি গেট খুলে দেয়।

অঞ্জলি বাজার দেখে চোখ বড়বড় করে ফেলে। বলে, 'একি করেছেন আপনি?'

মিজান বলল, 'এখন কোনো কথা না!'

অঞ্জলি কিছুটা হকচকিয়ে যায়। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

মিজান বলল, 'কোথায় নামাবে দেখিয়ে দেন! ওদের এভাবে কষ্ট হচ্ছে!'

অঞ্জলি বারান্দায় নামাতে বলে।

দুজনেই ওদের ঝাঁকা নামানোর সময় মিজানকে ধরতে বলে।

তারপর সহাস্যে ওরা ঝাঁকা থেকে একটা একটা জিনিস মেঝেতে

নামিয়ে রাখে।

কাজ শেষ হলে দুজনেই হাত পেতে দাঁড়ায়। মিজান পাঁচ টাকা করে দিতেই ওরা প্রায় এক সাথেই বলে, 'ভাঙতি নাই?'

মিজান বলল, 'বেশিই দিলাম! তোরা যা!'

যাবার সময় ওরা কলকল করতে করতে বেরিয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে বেশ খুশি হয়েছে।

অঞ্জলি বলল, 'এসব করতে আপনাকে কে বলেছে?'

বিস্মিত হবার ভান করে মিজান বলল, 'আপনিই তো!'

তারপর পকেট থেকে ফর্দটা বের করে দেখিয়ে বলল, 'এটা কি আমি বানিয়েছি?'

অঞ্জলি বলল, 'ওতে এত কিছুর কথা লেখা নেই!'

'আছে! ইচ্ছে করেই যেগুলো লেখেননি, সেগুলো আমি নিয়ে এলাম।'

অঞ্জলি বাজার দেখে মনেমনে কি ভাবে কে জানে। কিন্তু তাকে খুশি মনে হয় না।

মিজান বলল, 'যেগুলো ফ্রিজে রাখা যায় সেগুলো রেখে দিন! বেশিদিন টিকবে না এমনগুলো আজ থেকেই রান্না শুরু করতে হবে!'

অঞ্জলির চোখ দুটো টলমল করে উঠল। বলল, 'বন্ধুর পরিবারকে করুণা করছেন নাকি টাকার গরম দেখাচ্ছেন?'

মিজান মনেমনে রেগে যায়। ভাবে, মেয়েটা আসলে কি! পেটে ভাত নেই এক দানা আর মুখে বলছে পিত্তি জ্বালানো কথা!

মিজানকে ভাবতে দেখে অঞ্জলি বলল, 'সরি! আমি আসলে গুছিয়ে বলতে পারিনি!'

মিজান বলল, 'আগে এগুলো গুছিয়ে রাখেন! পরে যা বলবার বলব!'

সৃষ্টি মিজানকে ধরে বলল, 'চাচ্চু! তুমি ঘরে এসে বসো। আমি আজ তোমার সাথে খাব!'

'তাই?'

'হ্যাঁ!'

মিজান সৃষ্টিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা মা মনি! আমাকে খেতে দেবে তো?'

'তুমি কি বোকা? আমরা খেলে তোমাকে তো দেবই!'

'গুড! ভেরি গুড!'

তারপর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মিজান সৃষ্টির কানে মুখ লাগিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে একটা খুব ভাল খবর আছে!'

মিজান ঘুরে বসতেই দেখতে পেলো অঞ্জলি তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মিজান ভাবল, হয়ত অনুমান করছে কানেকানে কি কথা বলা যায়!

সৃষ্টি বলল, 'খবরটা কি বল না!'

মিজান আস্তে আস্তে বলল, 'এখনই আম্মুকে সব বলে দিও না যেন!'

'আচ্ছা বলব না!'

মিজান বলল, 'তোমার ক্লাস যেদিন শুরু হবে, সেদিনই তোমার ইউনিফর্মের জন্যে মাপ নেবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

মিজান ঘরের কোনের দিকে দেখতে পেলো টিভিটা আগের জায়গাতেই ঠিক একই ভাবে রাখা আছে। মনেমনে দোকানের ছেলেটার প্রশংসা করে মিজান।

তারপর সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের টিভিটা কি ঠিক হয়ে গেছে?'

সৃষ্টি একবার হেসে মুখে হাত চাপা দিয়ে ভেতরের দরজার দিকে তাকালো। কিন্তু কিছু বলল না। মিজান তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখতে পায় অঞ্জলি ট্রে হাতে করে এদিকেই আসছে। সে আবার বলল, 'টিভি কি ঠিক হয়ে গেল?'

অঞ্জলি এগিয়ে এসে ট্রে থেকে চা-বিস্কিট নামিয়ে রেখে বলল, 'ভেবেছেন আপনিই চালাক! আর কেউ নেই?'

মিজান ভাবল, 'ছেলেটা কি সব বলে দিয়েছে?

'কি ভাবছেন?' অঞ্জলি হেসে বলল, 'ছেলেটা সব বলে দিয়েছে কিনা?'

মিজান কিছু বলার আগেই অঞ্জলি আবার বলল, 'ও সব ফাঁস করে দিয়ে বলেছে আপনাকে যেন কিছু না জানাই!'

মিজান চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা! জানাতে হবে না কিছু!'

'আপনার এমন চালাকি করবার কি দরকার ছিল? আপনি কি দুরের মানুষ?'

চায়ে চুমুক দিয়ে মিজান বলে, 'কেন? বিক্রির জন্যে দিয়েছিলেন

আমাকে বলতে পারেননি? আমি তো আর আপনাদের ক্রিটিক্যাল আত্মীয় না যে, সবার কাছে বলে বেড়াব!'

'বুঝেছি!'

মিজান জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝেছেন?'

'বুঝেছি যে, আপনার কাছে কিছুই লুকোনো ঠিক হবে না!'

'বুদ্ধি-শুদ্ধি তাহলে কিছু আছে! আমি তো ভেবেছিলাম...!'

মিজান কথা শেষ করবার আগেই আবার অঞ্জলি বলে, 'কি ভেবেছিলেন?'

'এই যা! ভুলে গেছি!'

সৃষ্টি হিহি করে হেসে উঠল।

'রান্না বসিয়ে দিয়েছি! দুপুরে খাবেন!'

'আমারগুলো দিয়ে আমাকেই?'

অঞ্জলি চোখ পাকিয়ে বলল, 'যথেষ্ট অপমান করেছেন! এবার কিন্তু আমার পালা!'

'পি-জ!'

মিজান হাত তোলে। বলে, 'যদি দু মিনিট বসার সময় থাকে তাহলে একটু স্থির হয়ে বসেন। দুটো কথা জানার আছে। সময় হবে?'

'এক মিনিট! বলে অঞ্জলি ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসেই বলল, 'কি জানার ছিল?'

মিজানের চা খাওয়া হলে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনার সার্টিফিকেটগুলো কোথায়? বাড়িতেই আছে?'

'আছে! কিন্তু কেন?'

'যেহেতু আমি আপনাদের জন্যে খরচ করলে অপমান করা হয়। তাই ভাবলাম আপনার একটা চাকরি নেয়া উচিত!'

'আমিও ভাবছিলাম! কিন্তু অমন ন'টা-পাঁচটা অফিস করতে পারব না মেয়েটার জন্যে।'

'তাহলে কি ভাবছিলেন?'

'সেলাইর কাজ জানি! গান জানি! গান শিখিয়ে টুক-টাক সেলাই করে আমাদের মা-বেটির চলবে না?'

'খুব চলবে! তবে আমার মনে হয় আপনি স্কুল টিচার হলেই সব দিক দিয়ে ভাল হত।'

'তা তো হতই! কিন্তু...।'

‘স্কুলে কাজ করবেন?’

‘কে দেবে চাকরি?’

‘সৃষ্টির স্কুলে হলে কেমন হত?’

‘তাহলে আর কোন চিন্তাই থাকত না!’

অঞ্জলির মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

‘তাহলে কাগজ-পত্র নিয়ে সৃষ্টির ক্লাস শুরুর দিন প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন টিচারের একটা পোস্ট নাকি খালি আছে!’

‘যদি জানতে চায়, কিভাবে জানলাম?’

‘আমার কথা বলবেন! ভদ্রমহিলা আমাদের পরিচিত! রশিদও কিছু দিন ওনার মেয়েকে পড়িয়েছে। আজ আলাপ হল! আপনার কথা বলেছিলাম।’

অঞ্জলির হাসিহাসি মুখ থাকা সত্ত্বেও চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

সৃষ্টি মিজানের কাছ থেকে উঠে তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, ‘কাঁদছ কেন আম্মু?’

চোখ মুছে অঞ্জলি বলল, ‘খুশিতে!’

তারপর মিজানের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কে আপনি? আপনার মনটা এত ভাল কেন? আমাদের জন্যে আর কত করবেন?’

মিজান হেসে বলল, ‘ইচ্ছে তো ছিল সারা জীবন ধরেই আপনাদের জন্যে কিছু একটা করি! কিন্তু আপনার চাকরি হয়ে গেলে তো আমার কোনো কাজই থাকল না! তখন মাঝে মধ্যে এলে অন্তত এক কাপ চা খেতে দেবেন!’

‘আপনার মনটা খুবই ছোট! মাত্র এককাপ চা?’

সিক্ত চোখেই হাসল অঞ্জলি। যেখানে সহস্র সূর্য খেলা করছে আগামী দিনের নিশ্চয়তায়।

পাঁচ

ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যেতেই মিজানের তিনটে টিউশানি কমে গেল। তাই বিকেলের দিকে তার তেমন কোন কাজ থাকে না বলে সময়টা কিছুতেই কাটতে চায় না। অবসর সময়টা পার করতেই বেশিরভাগ সময় সে পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে কাটিয়ে দেয়।

আজও সে পাবলিক লাইব্রেরির উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে ছিলো। কিন্তু তার কাছে হঠাৎ মনে হল সেদিনের পর টুসির সাথে দেখা করেনি আর। একবার টুসির সাথে দেখা করা দরকার।

ঘড়িতে সে সময় দেখল, সাড়ে তিনটে বাজে। অফিস পাঁচটা পর্যন্ত। টুসিকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তার আগে একটা ফোন করে গেলেই ভাল হবে। পাবলিক কল সেন্টারে গিয়ে সে টুসির অফিসে ফোন করে। টুসিই ফোন ধরে। ‘হ্যালো টুসি। আমি মিজান। তোর অফিসে আসছি। থাকবি তো?’

ও প্রান্ত থেকে টুসি বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আছি। তুমি চলে এস।’

একটা স্কুটার নিয়ে মিজান ইস্টার্ন টাওয়ারের সামনে নামে। লিফট বেয়ে টুসির অফিসে ঢুকে ঠিক দরজার মুখেই টেবিলে বসা লোকটাকে বলল, ‘এম ডি বসেন কোন দিকে?’

লোকটা হাত তুলে ইশারা করতেই মিজান সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দেয়। ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ বলে, ‘কাম ইন।’

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই টুসির পাশে আরেকজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় মিজান।

ব্যাপারটা টুসিও বুঝতে পারল। বলল, ‘এস।’

একটা চেয়ার টেনে বসতেই টুসি পাশে বসে থাকা মহিলাকে দেখিয়ে বলল, ‘দ্যাখ তো একে চিনতে পারো কিনা?’

মিজান ঠিক বুঝতে পারে না মহিলা কে। বলল, ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।’

মহিলাটিকে বলল, ‘এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছিস?’

মহিলা হাসল। বলল, ‘চিনব কি করে? আগে তো দেখিনি!’

‘কতবার দেখেছিস। একদা তোর প্রিয় মানুষদের একজন।’

ঘরের আবহাওয়া কেমন থমকে গেল যেন। হঠাৎ করেই যেন নিঝুম হয়ে গেল সব। টুসি দুজনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

মিজানের হঠাৎ মনে হল পোস্টারে দেখা বুলি ওয়াহিদার ছবির সাথে এর অনেক মিল। সে বলে উঠল, ‘তাহলে কি এ বুলবুলি?’

‘এগজাক্টলি!’ টুসি নড়ে চড়ে বসে।

বুলবুলি বলল, ‘টুসি, তুই কি আমাকে গাধা ভাবিস? মিজানের চেহারায় তো কোনো চেঞ্জ আসেনি যে চিনতে অসুবিধা হবে!’

‘তাহলে ও কথা বললি যে?’

‘দেখলাম ও আমাকে মনে করতে পারে কিনা।’

মিজান সহজ হয়ে আসে। বলে, ‘আরে ভুলেই গেছিলাম। সেদিন টুসির কাছে তোর কথা না শুনলে আর পোস্টারে ছবি না দেখলে মনে করতে

পারতাম না।'

'ও। তাই বল।' বুলবুলির কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়ে। 'মন থেকে আমাকে মুছে ফেলেছ ঠিকই!'

মিজান বলল, 'টুসি, এত কষ্ট করে এলাম, কোই চা-কফি কিছু দিবি না খালি মুখেই বসিয়ে রাখবি?'

টুসি ইন্টারকমের বোতাম টিপে কফির কথা বলে।

বুলবুলি বলল, 'দ্যাখ মিজান, আমার কথাটাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কিন্তু।'

মিজান বলল, 'বুলবুলি, বুড়িগঙ্গায় একসময় প্রবল বেগ ছিল। পানিও ছিল ফ্রেশ। কিন্তু ঢাকা শহরের সব নর্দমার পানি গিয়ে বুড়ি গঙ্গায় পড়তে পড়তে আজ তার বুক কলংকিত। হাড়-জিরজিরে বুকের প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ ভরা। তার দু পাড় যে যেভাবে পারছে দখল করে নিচ্ছে। এখন যদি কেউ বলে যে, বুড়িগঙ্গা নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে কি দোষটা তার না তার তীরবর্তি মানুষগুলোর?'

বুলবুলি বলল, 'তোমার কথার বেসাতি এখনো ছাড়োনি?'

'ওটাই যে আমার পুঁজি। একটা মানুষের কোনো পুঁজি না থাকলে সে টিকবে কি দিয়ে? এই যেমন টুসির পুঁজি আছে। ব্যাবসায় খাটাচ্ছে। তোর গলায় সুর আছে। তা দিয়ে বানিজ্য করছিস। এগুলো না হলে কি করতিস?'

পিয়ন কফি দিয়ে যায়।

সামনে কফির মগ ঠেলে দিয়ে টুসি বলল, 'ওর সাথে কথায় পরবি না। বাদ দে ওসব!'

বুলবুলি বলল, 'মিজানের কি আজ কোনো কাজ আছে?'

মিজান বিস্ময়ের ভান করে বলে, 'আছে মানে? এখনো হাতে বারটা টিউশানি আছে। সাতটার দিকে যাব।'

'তাহল চল কোথাও যাই!' টুসি প্রস্তাব রাখে।

'ঢাকা শহরে সবই তো পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন যায়গা বলতে কোথায় যাব?'

বুলবুলি বলল, 'তুমিই বল।'

মিজান বলল, 'চল রুপনগর যাই। রশিদের বউ অঞ্জলি খুব ভাল গান করে। তোরা পরিচিতও হবি। এই ইমিটেশন্ড শহরে হাঁপিয়ে উঠলে সোজা চলে যাবি ওখানে। তোদের ভাল লাগবে। অঞ্জলির মেয়ে সৃষ্টি। ওকেও খুব ভাল লাগবে তোদের।'

'ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া!' টুসি বলল।

বুলবুলি বলল, 'গান কি খুব ভাল করে?'

মিজান বলল, 'খালি গলায় গাইতে শুনেছি। সাথে ইন্সট্রুমেন্ট থাকলে পুরোটা বোঝা যেত।'

বুলবুলি বলল, 'তুমি যখন বলছ ভাল তাহলে একবার টেস্ট নিতেই হবে!'

তারপর টুসির দিকে ফিরে বললো, 'তুই কি বলিস, টুসি?'

'ঠিক আছে। তাহলে চল এক্ষুনি।'

কফি খাওয়া শেষ করে টুসি আবার ইন্টারকমের বোতাম টিপে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে।

নিচে এসে ওরা গাড়িতে উঠে।

কি ভেবে টুসি ড্রাইভারকে বলল, 'আরিফ, তুমি বাসায় চলে যাও। আজ আমিই চালাই।'

আরিফ সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

টুসি বলল, 'মিজান সামনে চলে এস।'

'থাক না!' বুলবুলি বাধা দিয়ে বলে, 'তুই বকর বকর করলে একসিডেন্ট করবি। তারচে ভাল একাই চালা!'

টুসি বলল, 'ঠিক আছে। তোরা একটু কম কথা বলিস।'

শহরের পাশেই কোলাহল মুক্ত এমন একটা পরিবেশে সত্যিই ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। টুসি বলল, 'না এলে বিশ্বাসই করতাম না!'

বুলবুলি বলল, 'কিছু দিন পরই ঘিঞ্জি হয়ে উঠবে।'

'একদম উচিত হবে না! সরকারের নতুন আইন করা প্রয়োজন। প্রতিটা বাড়ির চারপাশে বিশ ফিট চওড়া সবুজ ঘাস-জমি রাখতে হবে।'

মিজান বলল, 'টুসি, তুই বাংলাদেশের মানুষ হওয়া ঠিক হয়নি রে!'

'কেন?' টুসি চোখ তোলে।

'ঢাকা শহরে থাকার জায়গার খুবই অভাব! অপচয়ের জায়গা এখানে নেই।'

'তবুও সবুজ কিছুটা থাকা চাই!'

'সে পরে দেখা যাবে। আগে তোরা গাড়ি থেকে নাম!'

মিজান ওদের তাড়া দেয়।

অঞ্জলিকে দেখে টুসি আর বুলবুলি দুজনেই প্রায় জড়িয়ে ধরল। বেশি খুশি হল সৃষ্টি। অনেক দিন পর তাদের বাড়ির আবহাওয়াটাই পাল্টে গেল যেন।

মিজানের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি বলল, 'এত বড়বড় মানুষ নিয়ে আসবেন, আগে একবার জানানোর প্রয়োজন ছিল না?'

'ছিল না।' মিজান বলল, 'কারন ওদের হাইট কারোরই পাঁচ ফুট না।'

'তবে রে!' বলে ঘুষি পাকায় টুসি।

মিজান হাসতে হাসতে সৃষ্টিকে নিয়ে বারান্দায় চলে যায়।

অঞ্জলি হতাশার ভঙ্গিতে বলল, 'এই হঠাৎ আমি কি করি?'

বুলবুলি অঞ্জলির হাত ধরে বলল, 'কিছুই করতে হবে না ভাই। তুমি আমাদের পাশে বসো। মিজান বলছিল তুমি খুব ভাল গান কর। আর তা শুনেই কোনো খবর বার্তা ছাড়া চলে এলাম!'

অঞ্জলি একটুও দমে না গিয়ে বলল, 'বুলি ওয়াহিদার সামনে আমি গাইব গান?'

টুসি বলল, 'হ্যাঁ। বুলি ওয়াহিদা আকাশ থেকে নেমে আসেনি। মানুষে পচা-ডিমও ছুঁড়ে মেরেছে!'

টুসির কথা শুনে অঞ্জলি বিস্ময়ে হা হয়ে যায়।

বারান্দা থেকে মিজান আর সৃষ্টির টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ ভেসে আসে।

অঞ্জলি বলল, 'আগের মত এখন আর হারমোনিয়াম নিয়ে বসা হয় না।'

বুলবুলি বলল, 'গান এমন একটা জিনিস, যা শিখলে কেউ ভোলে না!'

টুসি নিজেই হারমোনিয়াম নামিয়ে আনে বিছানার উপর।

তারপর ঠেলে দেয় অঞ্জলির দিকে।

একটা গান করতেই তার জড়তা কেটে যায়। তারপর আরেকটা গায়। তারপর আরো। সত্যিই মুগ্ধ হবার মতন কণ্ঠ।

বুলবুলি বলে, 'একটা ফোক গান করো তো!'

'কোনটা করব?' অঞ্জলি জানতে চায়।

টুসি বলল, 'তার আগে লালন শাহের একটা গান করো!'

টুসি, বুলবুলি দুজনেই মুগ্ধ হয়ে শোনে।

গানে গানে কখন যে সময় উতরে যায় কেউ খেয়াল করে না। মাগরেবের আজান শুরু হতেই অঞ্জলি হারমোনিয়াম সরিয়ে রাখে।

টুসি বলল, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'এই একটু চা করে আনি।'

টুসি বুলবুলি এক সঙ্গে উঠে। বলে, 'তোমার কিচেনটা দেখি!'

অঞ্জলি বলল, 'ছোট জায়গা।'

টুসি বলল, 'বাহ্ বেশ পরিষ্কার তো! ভেবেছিলাম নোংরা হবে।'

অঞ্জলি আহত কণ্ঠে বলল, 'এমন মনে হল কেন? গরিব বলে?'

টুসি বলে, 'আরে না বোকা! ভেবেছিলাম যারা গান করে তাদের কিচেন নোংরাই হয়।'

বুলবুলি টুসিকে ঠেলা দিয়ে বলে, 'আমার বদনাম করছিস?'

টুসি হেসে অঞ্জলিকে সাক্ষী মানে। 'আচ্ছা তুমিই বল, আমি কি তোমাকে বলেছি যে, বুলির কিচেন নোংরা?'

অঞ্জলি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে।

টুসি বলল, 'তাহলে চা করবার পর আমাদের জন্যে দুটো ভাত বসিয়ে দিও। শুটকি আছে?'

অঞ্জলিকে কিছুটা নার্ভাস মনে হয়। আঁচলে মুখ মোছে। বলে, 'আমি সেটা রাঁধতে জানি না বলে আনা হয় না।'

'তাহলে কি আছে? ছোট মাছ?'

'না। মুরগি আর গরুর গোশ।'

বুলবুলি বলল, 'আমাদের পোষাবে না। ডাল পাকাও আর আলু সেদ্ধ দিয়ে দাও। হোস্টেলে থাকতে ওটাই ছিল আমাদের সর্ট টাইমের আইটেম। বাড়িতে মন মত করতে পারি না!'

টুসি বলল, 'ডালটা বুলি রাঁধবে। ভর্তাটা কে করবে?'

অঞ্জলি বলল, 'আমিই করি!'

বুলবুলি বলল, 'নামাজ পড়লে যাও! আমরা চুলো সামলাই।'

অঞ্জলি ইতস্তত করে বলল, 'আপনারা?'

টুসি বলল, 'আমাদের প্রবলেম আছে!'

অঞ্জলি হেসে অজু করতে চলে যায়।

বুলি বলল, 'গাইলে মেয়েটা আমকেও ছাড়িয়ে যাবে মনে হয়।'

'কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না!' টুসি বলল। 'সবারই একটা নিজস্ব স্টাইল থাকে। এরও একটা স্টাইল আছে।'

বেশি দেরি করে না অঞ্জলি। কিচেনে ফিরে আসতেই বুলি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?'

'মাত্র তো তিন রাকাত।'

'কেবল ফরজ আদায় করেছে!' বলে, টুসি হাসল।

'এমন সময় সৃষ্টি এসে বলল, 'আন্টি, চাচু তোমাদের ডাকছেন!'

বুলি বলল, 'তুমি চাচুকে এখানে নিয়ে এস!'

কিছুক্ষণ পরই মিজানের ছাঁয়া পড়ে কিচেনের দরজায়। সে বলে, 'সাতটায় আমার টিউশানি আছে।'

টুসি বলল, 'তোমার টিউশানি আজ বাদ। আমরা ভাত খেয়ে যাব ভেবেছি। ক্লাসিক্যাল খাবার। কত্তদিন খাই না!'

মিজান হেসে বলল, 'তোদের কাছে ক্লাসিক্যাল। আর আমার কাছে বিষের মতন মনে হয়। গরিব আর মেসের বাসিন্দাদের কাছে এ খাবারটা অত্যাচারের মত। তোদের দলে আমি ভিড়তে পারব না!'

বুলি বলল, 'তুমি দুপুরের তরকারি দিয়ে খেয়ে নিও।'

তারপর অঞ্জলিকে বলল, 'দুপুরের বেঁচে যাওয়া তরকারি আছে না?'

অঞ্জলি মাথা দোলায়।

'কি রেঁধেছিলে?'

'গোশ।'

'মিজানটা খুশি হবে।'

'খুশি হব না! আমি খেতে চাচ্ছি না!'

বুলি বলল, 'তাহলে চলে যেতে পার। আমরা তোমাকে আটকাব না!'

মিজান বলে, আরেক জন কি বলে?'

'মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যানটেড!' টুসি বলল।

অঞ্জলি বলল, 'আমি ভেটো দিচ্ছি।

বুলি বলল, 'তাহলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মিজান আমাদের সাথেই খাচ্ছে!'

মিজান অঞ্জলির চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারল না।

চা হয়ে গেলে একটা কাপ মিজানের দিকে বাড়িয়ে দেয় টুসি।

মিজান কাপ নিয়ে ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে দেখতে পায় সৃষ্টি খাতা নিয়ে লিখতে বসেছে। সে বলল, 'মা মনি কি করছে?'

'হোম টাস্কগুলো করছি।'

'পড়া করবে কখন?'

'দুপুরে করে ফেলেছি।

'এই তো লক্ষি মেয়ে!'

'তোমার আম্মু তোমাদের ক্লাস নেয়?'

'নেয়।'

'কি কি পড়ায়?'

'ইংলিশ আর অংক।'

সৃষ্টি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা চাচু, তুমি তখন বলছিলে এত দিন ইচ্ছে করেই আমাদের বাড়িতে আসো নি। কেন আসো নি? আমাদের সাথে রাগ করে?'

'না তো! এমন কথা বলেছি নাকি?'

'তাহলে আজ কত্তদিন পরে কেন এলে?'

'আমার যে অনেক কাজ মা মনি!'

'এত কাজ করে কি হবে? তুমি কার জন্য এত কাজ করো?'

মিজান চমকে ওঠে। তাই তো! কার জন্যে আমি কাজ করি? কে আছে আমার?

'কি চাচু, কথা বলছ না কেন?'

মিজান কি বলবে? যেন কোনো এক অদৃশ্য ধাক্কার প্রাবল্যে হঠাৎ মুখ থুবরে পড়েছে সে। ফের উঠে যে দাঁড়াবে সে শক্তিটুকুও যেন অবশিষ্ট নেই। সৃষ্টি জানে না যে, কত বড় এক সত্যের মুখোমুখি আজ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে। সত্যিই সে জানে না কার জন্যে এত কাজ করছে!

সৃষ্টি আবার তাড়া দেয়।

মিজান কোন জবাব দিতে পারে না। বলে, 'আমি তো জানি না মা মনি!'

সৃষ্টি আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু মিজানের মন খারাপ হয়ে যায়।

অঞ্জলি এসে তাড়া দেয়, 'এই যে, মন খারাপ করে বসে আছেন ক্যান? আপনার বন্ধুরা সামনে পে-ট নিয়ে বসে আছে!'

মিজানের খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই। তবুও সে না করতে পারে না। সে বুঝতে পারে না কেন অঞ্জলিকে সে কখনোই মুখের ওপর না করতে পারে না। এটা কি অঞ্জলি বোঝে?

অঞ্জলি ফিরে যেতেই মিজান সৃষ্টিকে বলে, 'চল মা মনি!'

সৃষ্টি বলে, 'তুমি যাও! আমি লেখাটা শেষ করেই আসছি।'

মিজানকে দেখেই টুসি আর বুলি নিজেদের পাতে ভাত নেয়।

ফ্লোরের ওপর মাদুর বিছিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিজান বুলির পাশে বসতে বসতে বলল, 'তোদের দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে,

তোরা এ বাড়ির মানুষ না!'

টুসি বলল, 'আমরা যে এ বাড়ির মানুষ না তোমাকেই বা বলল কে?'

মিজান বলল, 'বেশ বেশ! তোরা এ বাড়ির মানুষ জেনে সুখি হলাম।'

বুলি বলল, 'কদিন পর আবার ঈর্ষা কোরো না যেন!'

'এক-আধটু ঈর্ষা তো হতেই পারে! নাকি?'

'দেখা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি বেচারিকে রেহাই দাও। আজ অনেক জ্বালিয়েছি!'

'আর জ্বালাতন করবি না বলে ঠিক করেছিস নাকি?'

'বোর্ডে সিদ্ধান্ত নেব।'

'তুই দেখছি সবখানেই তোর এমডি গিরি দেখাতে চাস!'

একটা হাসির হররা বয়ে যায় ঘরের ভেতর।

মিজান একবার মুখ তুলে অঞ্জলিকে দেখে। সুখিসুখি অঞ্জলিকে দেখে খুব ভাল লাগল তার। কে বলবে এই মহিলার কদিন আগেও ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার!

বাইরে থেকে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে আসে। গ্রামগ্রাম বলে মনে হয়। সময়টা বেশ কেটেছে। ওদের বিদায় নিতে রাত আটটার মত বেজে যায়।

অঞ্জলি আর সৃষ্টি তাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে। টুসি আর বুলি সামনে এগিয়ে যেতেই অঞ্জলি বলল, 'আমাকে চাকরি জোগাড় করে দিয়ে কি দায় মুক্ত হয়ে গেলেন?'

মিজান যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে, 'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'এতদিন এলেন না যে?'

'সরি!' কোনোরকম ঝামেলায় জড়াতে চায় না মিজান। সাথে সাথেই হার মেনে নেয়। বলে, 'সময় হয়নি। আজ তো বন্ধুদের নিয়ে এলাম।'

'এরা আপনার বন্ধু না আরো কিছু?'

মিজান বুঝতে পারে অঞ্জলির মনের ক্ষোভ। বলে, 'আমার ক্লাসমেট। একখানে হলে ইউনিভার্সিটি লাইফের গন্ধ পাই!'

'নেক্সট কবে আসছেন?'

'খুব শিঘ্রিই আসব।'

'সেটা কবে?'

অঞ্জলির কণ্ঠে ঝাঁজ বোঝা যায়।

মিজান বলল, 'খুব বেশি হলে দুহপ্তা।'

'মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'সয়্যার!'

'সয়্যার!'

গাড়িতে উঠবার আগে মিজান একবার পেছন ফিরে তাকায়। অঞ্জলি আর সৃষ্টি তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কিছু দুর এগিয়ে টুসি বলল, 'মিজান কি বুঝতে পার যে অঞ্জলি তোমাকে কতটা ভালবাসে?'

'সেটা কি করে বলব? আমি তো আর দাড়িপাল-া নিয়ে আসিনি!' মিজান ক্ষেপে যায়।

বুলি বলল, 'শুধু শুধু ক্ষেপছো ক্যান?'

মিজান বলল, 'ক্ষেপবো না? এমন আজগুবি কথা বললে কি হাসব?'

টুসি বলল, 'যাই বল। মহিলাকে আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে! ভাবছি ওকে একটা ব্রেক দেব।'

'কিসে?' মিজান জিজ্ঞেস করল।

'গান অথবা মডেলিং। দুটোতেই চমৎকার মানিয়ে যাবে!'

'আমি অবশ্য মডেলিং-এর কথা ভাবিনি।'

'মডেল হলে ক্ষতি কি?'

'তেমন যোগ্যতা তার আছে বলে মনে হয় না।'

'শুরুতেই কারো যোগ্যতা থাকে না। তৈরি করে নিতে হয়।' টুসি রাস্তায় বাঁক নিয়ে বলল।

মিজান বলল, 'সেটা তোরা আলাপ করে দেখতে পারিস। তবে আমার যদ্দুর মনে হয়, অঞ্জলি মডেলিং এ রাজি হবে না!'

টুসি বলল, 'বুলি কিছু বলছিস না যে?'

বুলি বলল,' আমারও তাই মনে হয়। মডেল হতে রাজি হবে না।'

'উইক এন্ডে আবার আসব। মিজান আসবে?'

টুসি চকিতে একবার মিজানের দিকে তাকায়।

'না। তোরা বাণিজ্য করতে আসবি। আমি কেন তোদের বোঝা হব?'

টুসি ঘাড় কাত করে বলল, 'অ্যাজ ইউ লাইক!'

গাড়ি ফার্মগেট আসতেই মিজান বলল, 'আমাকে এখানেই নামিয়ে দে।'

বুলি বলল, 'তুমি না মালিবাগে থাকো! তুমি মৌচাক নামবে।'

'তাহলে তো আরো ভাল হয়!'

টুসি বলল, 'মিজানের ফোন নেই কেন? প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারি না।'

'ফোনের শব্দটা আমার কাছে বিষের মতন মনে হয়!'

'আমি তো আগেই বলেছি, তোমাকে আমার সব সময় দরকার। কথাটা বুঝতে চাইছ না কেন? একটা মোবাইলফোন নিলে কি হয়?'

'সে তো অনেক খরচের ব্যাপার!'

'তোমার কোনো খরচ লাগবে না। কাল এস। একটা ফোন তোমাকে দেব। বিল-টিলের ঝামেলা নেই।'

মিজান বলল, 'বড়লোকি দেখাচ্ছিস আবার?'

বুলি মিজানের হাতে ধরে চাপ দিয়ে বলে, 'না কোরো না। পি-জ! তুমি আমাদের ফ্রেন্ড। আমরা তোমাকে আমাদের পার্টনার হিসেবে পেতে চাই, সেটাতেও তোমার আপত্তি! এটা কি তোমার অহংকার বলে ধরে নেব?'

'না। তাহলে আমাকে খুব ছোটো করা হবে।'

'আমাদের কোন কথাই তুই শুনছিস না। তাতে আমরা কি খুব বড় হয়ে যাচ্ছি?'

টুসি ক্ষেপে গেছে। টুসি ক্ষেপে গেলেই মিজানকে তুই তোকারি করে কথা বলত।

মিজান বলল, 'যা যা! আর প্যানপ্যান করিস না! তোর ফোন জোগাড় করে রাখিস!'

'দ্যাটস আ গুড বয়!' বলে, টুসি মৌচাক ফুট ওভার ব্রিজের কাছে গাড়ি থামিয়ে দেয়।

মিজান নেমে গিয়ে বলে, 'আগামী কাল দেখা হচ্ছে। চারটায়।'

টুসি বুলি চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে।

একটা রিকশা নিয়ে মিজান মেসে ফিরে দেখল বিদ্যুৎ নেই। অন্ধকার তার কাছে কোনোদিনই ভাল লাগেনি। আজও লাগল না। সে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কোণার দিকে একটা টেবিলে বসে চায়ের অর্ডার দেয়। মোমের আলোতে পরিবেশটা কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। বেয়ারা চা নিয়ে আসতেই সে জিজ্ঞেস করে ফেরদৌসের খবর। কিন্তু ছেলেটা বলতে পারে না।

মিজান চা খেতে খেতে অপেক্ষা করে কখন বিদ্যুৎ আসবে। কিন্তু তার ধৈর্যে আর কুলোয় না। চায়ের বিল মিটিয়ে দোকান থেকে একটা মোম নিয়ে সে তার ঘরে যায়। তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতেই কেমন একটা

গুমোট গন্ধ হামলে পড়ে।

মোমটা জ্বালিয়ে সে কাপড় পাল্টিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে ফ্যানটা অন করে দেয়। বিদ্যুৎ এলে যেন আবার উঠে গিয়ে কষ্ট করে ছাড়তে না হয়। খুবই ক্লান্ত লাগছিল বলে দরজা বন্ধ করে সে বিছানায় শুয়ে ফু দিয়ে মোমটা নিভিয়ে দেয়। আর মুহূর্তেই একঝাঁক অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় মিজানের।

বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে সে বিছানা ছাড়ল। আজকের দিনের পরিকল্পনায় সকালের দিকের টিউশানিগুলো সেরে নিনির সাথে দেখা করার কথা ভাবে। আর এ ভাবনা হতেই সে নিজকে চোখ রাঙায়। সে কি নিনির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে?

তারপরই আবার ভাবল, নিনির দিক থেকে কোনো দুর্বলতা নেই? না ও থাকতে পারে। মেয়েটা খুবই সহজ সরল আর মনটাও বেশ পরিষ্কার বলে মনে হয়। তার ভেতরে এখনো শিশুর সারল্য রয়ে গেছে। জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা হলেও জীবন তাকে তিক্ত করে তুলতে পারেনি। যার ফলে মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করে ফেলতে পারে।

নিনিদের বাসায় পৌঁছতে বেলা একটা পেরিয়ে গেল মিজানের। ঘরে ঢুকেই সে তিন্নির দেখা পেয়ে যায়। 'আরে মিজান যে! এ কদিন কোথায় ছিলেন?'

'টনির তো পরীক্ষা চলছে। তাই ভাবলাম এখন আর এসে কি হবে!'

'তবু খোঁজ নেবার দরকার নেই যে, ছাত্রটা কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে?'

'তাতো ঠিকই! আর সে জন্যেই তো আসা!'

তিন্নি বললেন, 'আচ্ছা, আপনার কি একটা ফোন থাকা উচিত ছিল না?'

'কেন? আমি একা মানুষ। আমার আবার ফোনের কি কাজ?'

'এই যে আমাদের কোনো প্রয়োজনে আপনাকে খুঁজে পাই না। কোনো ভাবে যোগাযোগ করতে পারি না। নিনিটার জ্বর যাচ্ছে কদিন ধরে। ও তো আপনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে! মেইনলি ও-ই বলছিল ফোনের কথা!'

'ঠিক আছে ফোন একটা নেব। আমার বন্ধুরাও এই ফোনের জন্যে আমাকে খুব জ্বালাতন করছে।!

তিন্নি কিছু না বলে হাসলেন।

মিজান বলল, 'টনির আজ পরীক্ষা আছে। কেমন হচ্ছে বলেছে কিছু?'

‘বলল তো ভালই হচ্ছে! প্রশ্নগুলো ওর জন্যে নাকি খুবই ইজি হচ্ছে।’

‘তাহলে বোঝা যাচ্ছে পড়া-শুনায় একদম ফাঁকি দেয়নি।’

তারপরই সে আবার জানতে চাইল, ‘আচ্ছা নিনির কি অবস্থা এখন?’

‘তেমন চেঞ্জ নেই। সকালে জ্বর ছেড়ে যায়। সন্ধ্যার দিক থেকে আবার আসতে থাকে।’

তিন্নি আবার বললেন, ‘আসেন আমার সাথে! নিনি তার ঘরেই আছে।’

মিজান কেমন ইতস্তত করছে দেখে তিন্নি বললেন, ‘আরে ভাই আসেন না! আপনার সংকোচের কি আছে? নিনিই খুঁজছিল!’

উপরে উঠে নিনির ঘরের সামনে এসে দরজায় একবার টোকা দিয়ে তিন্নি বললেন, ‘নিনি জেগে আছিস? মিজান এসেছে। বলে, তিনি পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

তারপর মিজানকে ডাকলেন, ‘কোই, আসেন!’

নিনি বিছানায় উঠে বসেছে।

এই কদিনের জ্বরে নিনি অনেকটা শুকিয়ে গেছে। গাছের ডাল থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে রাখলে সেটা যেমন রস-কষহীন হয়ে যেতে থাকে, নিনিকেও দেখাচ্ছে ঠিক তেমনি। এ অবস্থায় মিজানের বুকটা কেমন হুঁ-হুঁ করে উঠল।

নিনি হাতের ইশারায় মিজানকে তার পাশে বসতে বলে।

তিন্নি বললেন, ‘নিনি একটু চা খাবি? ভাল-াগবে!’

নিনি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়।

‘আমি তোদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি!’ বলে, তিন্নি বেরিয়ে গেলেন।

পাশে বসতেই নিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরল মিজানকে। বলল, ‘আপনার শরীর এমন ঠান্ডা কেন?’

মিজানের অস্বস্তি লাগে। কিন্তু সরে যায় না। বলে, ‘আপনার শরীরে টেম্পারেচার হাই বলে এমনটা মনে হচ্ছে।’

নিনি মিজানের কাঁধে মুখ রেখে বলে, ‘আপনাকে এভাবে ধরে থাকতে আমার খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা আমি কি আপনাকে এ ভাবে সারাজীবন ধরে রাখতে পারব? পারব না?’

মিজান তার অস্বস্তি ভাব কাটিয়ে উঠে বলল, ‘ইচ্ছে করলেও ধরে রাখা যায় না। এই যে, আকাশে মেঘগুলো ভেসে বেড়ায়, ওরা যখন গলতে আরম্ভ করে, বাতাস কি ওদের ধরে রাখতে পারে? তেমনি মানুষও মানুষকে

সারাজীবন ধরে রাখতে পারে না!’

‘কেন এমনটা হবে?’

‘এটাই মানুষের নিয়তি! আপনার হাজবেন্ড কি আপনাকে ধরে রাখতে পেরেছে? পারেনি। আমিও ধরে রাখতে পারিনি মৌরীকে। এর পেছনে আমার যুক্তি হচ্ছে বিবাহিত জীবনের একটা সময় পর্যন্ত একজন অন্যজনকে ধরে রাখে। একজনের বাহু আলগা হয়ে গেলে অন্যজন শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। কিন্তু একজনের শক্তিতে অন্য জনকে বেশি দিন ধরে রাখা যায় না!’

নিনি হঠাৎ তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলে, ‘এই, চলেন না আমরা বিয়ে করে ফেলি! আমি কোনোদিনই আমার বাহু আলগা করব না!’

মিজান হাসল। বলল, ‘এটা কি হয়, না হতে পারে?’

‘কেন পারে না?’

নিনি আরো চেপে ধরে মিজানকে।

আমিও মৌরীকে অনেক চেষ্টা করেছিলাম ধরে রাখতে। পারিনি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে পচে যাওয়া রশি আঁকড়ে কত দিন ঝুলে থাকতে পারে একটা মানুষ? সে ও পারেনি। তাই ছিটকে দুরে সরে গেছে। আপনি আরো আগেই হেরে যাবেন। আসলে আমার নিয়তি আমাকে ভাল থাকতে দেবে না। আপনি মিছেমিছি স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আমাকে!

নিনি মিজানকে ছেড়ে দিয়ে হেসে বলল, ‘স্বপ্ন আপনাকে দেখাচ্ছি না। নিজেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। স্বপ্ন তো কখনো সত্যি হয় না তাই না?’

‘হয়। কোনোকোনো স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায়।’

‘আমার স্বপ্নও সত্যি হবে। আমি কোনো দিবা স্বপ্ন দেখছি না।’

‘ভাল। ভয় পাবেন না। আমি আছি আপনার পাশে। আপনার স্বপ্ন সত্যি করতে যদি আমাকে প্রয়োজন হয়। আমি পিছিয়ে যাব না। তবে একটাই অনুরোধ থাকবে আমরা যদি কখনো ব্যর্থ হই, সেই দায়ভার যেন একাই আমার কাঁধে এসে না চাপে। মৌরী নেই। পালিয়ে গেছে। একবারও বলবার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন সে চলে যাচ্ছে!’

নিনি বলল, ‘সংসার জীবনটা দুজনেরই আপস করে নিতে হয়। সেখানে এক তরফা কিছু হলেই আসে সংঘাত। আমার গাড়ি বাড়ি সোনা দানা টাকা পয়সা কিছুরই দরকার নেই। আমি চাই যার ওপর আমি নির্ভর করব সেও আমার ওপর তেমনি নির্ভর করুক। সেটা তো আপনি পারবেন। পারবেন না?’

মিজান বলল, 'আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না।'

'আমার দিক থেকেও না।' নিনি জোর দিয়ে বলল।

মিজান বলল, 'ঠিক আছে। আমাকে সময় দিন। ততদিনে নিজকে আমি তৈরী করে নেই। আর আপনিও ভাবতে থাকেন। আবেগের সাথে বাস্তবতাও একটু থাকতে হয়, নইলে পরে পস্তাতে হতে পারে।'

তিন্নি নিজেই চা নিয়ে এলেন।

মিজান তিন্নির হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে বিছানার উপর রাখে।

তিন্নি যাবার সময় বলল, 'মিজান কিন্তু হুট করে চলে যাবেন না! ভাত খেয়ে যাবেন!'

মিজান ঘড়ি দেখল। কিন্তু কিছু বলল না।

নিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি একটা ফোন নিতে পারেন না? এই ক'দিন আপনাকে কতবার মনেমনে আশা করেছি!'

'টুসি বলেছে আজ একটা ফোন আমাকে দেবে। চারটের দিকে যাব।'

নিনি বলল, 'টুসি কে?'

'আমার ফ্রেন্ড। একই ক্লাসে পড়েছি। ইস্কাটনে বিরাট অফিস। এ্যাড ফার্ম।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হাজবেন্ড থাকে ইটালিতে। মিলানে। মাঝেমাঝে ও সেখানে গিয়ে বেড়িয়ে আসে। নিজেও আগে ছিল।'

নিনি বলল, 'আরে মিলানে আমিও ছিলাম। কিন্তু টুসি নামটা তো মনে পড়ে না। একদিন আমাকে নিয়ে চলেন না!'

'আপনার জ্বর সারুক। নিয়ে যাব। টুসি বলছিল ওর সাথে জয়েন করতে। কিন্তু আমি তো ব্যবসার কিছু বুঝি না। অবশ্য ও বলেছে আমাকে কিছুই বুঝতে হবে না। শুধু মিটিংগুলোতে এ্যাটেন্ড করলেই চলবে।'

নিনি বলল, 'আসল কাজ তো ওটাই। মিটিং-টিটিং এর ব্যাপারে মেয়েদের অনেক সমস্যা থাকে। আমি সেটা বুঝতে পারি।'

'তাহলে এত সব টিউশানি ছেড়ে দেব?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বলছেন?'

'বলছি এ জন্যে যে, জীবনে এস্টাবি-শমেন্টের দরকার আছে। নিজেকে যখন প্রতিষ্ঠা করে ফেলবেন। মেরুদন্ড যখন আপনার শক্ত হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবেন মৌরীর দুঃখটা কোথায় ছিল।'

মিজান ভাবে, জীবনটা কেন এত জটিলতায় ভরা? সে যেমন সিম্পল লাইফ পছন্দ করে অন্যরা তেমন নয়। এই যে, নিনিও তাকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, সেও জীবনে স্বচ্ছলতা চায়। চায় মিজানেরও প্রাচুর্য থাকুক। তা কি নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেই?

রাস্তায় তেমন ভিড় চোখে পড়ল না। সাধারণতঃ এ সময়টা আর সকালের দিকে ঢাকার রাস্তায় ভিড় লেগেই থাকে। যানজট শব্দটা প্রায় সবখানেই শোনা যায়। হঠাৎ করে মিজানের মনে পড়ল যে, আজ বিষুদবার। সরকারি অফিস আগেই ছুটি হয়ে গেছে। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট ভাবেই সে টুসির অফিসের সামনে এসে নামল।

টুসির রুমে ঢুকতেই মিজানের মনে হল টুসি এতক্ষণ তার অপেক্ষাতেই ছিল। তার মুখের নির্ভাবনার হাসিই সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। সে জানতে চাইল, 'তো ক্যামন আছিস এম ডি ম্যাডাম?'

'উঁহু। ম্যাডাম বললে একটু কারেকশান লাগবে যে!'

মিজান প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে বুঝতে পেরে হেসে উঠল সশব্দে।

তারপর বলল, 'কোই আমার ফোন?'

'তুই তো দেখছি এখনো অভদ্র আছিস! কোথায় এইমাত্র এসেছিস। একটু বয়। কথাবার্তা বল। কফি খা। না, আমার ফোন কোই? ছোটোলোক কোথাকার! তোর মত এই হাউজ টিউটরগুলো একেকটা গাধা। সৌজন্য বলে যে একটা শব্দ আছে, তা যেন জীবনে শোনেওনি দেখেওনি। অথচ বড়বড় মানুষরা টাকা খরচ করে একেকটা সিম্পোজিয়াম সেমিনারে এ্যাটেন্ড করে। আর তা কেন করে জানিস? অন্যের আচরণ দেখে, অন্যের কথা শুনে নিজকে ইম্প্রুভ করবার জন্যে!'

তারপর ড্রয়ার খুলে একটা মোবাইল ফোন আর চার্জার সমেত প্যাকেট মিজানের সামনে রেখে আবার বলল, 'প্রতি আট ঘন্টায় আমাকে একটা কল দেবে। যদি মাঝখান দিয়ে আমি কল করি তাহলে চার ঘন্টায় একটা।'

'বুঝলাম। তারপর?'

'আমি আর বুলি ঠিক করেছি অঞ্জলির একটা রেকর্ড বের করব।'

'হিজ মাস্টার্স ভয়েজের পর রেকর্ডের যুগ শেষ। এখন ক্যাসেট আর সিডি।'

'ওই একই হল। এখন তো এই ক্যাসেট আর সিডিরই রমরমা ব্যবসা!'

'এখন ভিক্ষের গান বাজারের টপ চার্টে আছে। বুলবুলিও তো ওইসব

হুম হাম গান করে। অঞ্জলিকে দিয়ে এসব গান হবে না।'

'বুলিও তাই বলেছিল। আইডিয়াটা তো ওরই।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। বুলি বলছিল, ফোক আর হারানো দিনের গান দিয়ে ক্যাসেট বের করা যায়। ঠিক মত পাবলিসিটি করতে পারলে ব্যাবসা খারাপ হবে না!'

'অঞ্জলির লাভটা কি?'

'ক্যাসেটগুলো বাজার পেয়ে গেলে তারও লাভ হবে। ভেব না ওকে ঠকাব। নতুন হিসেবে যা দেব ও কল্পনাও করতে পারবে না!'

মিজান আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু ও কি রাজি হবে?'

'সেটা তোমার দায়িত্বে আছে। আর এ জন্যেই তোমাকে পার্টনার করেছি। ইচ্ছে করলে তোমার পছন্দ দিয়েও একটা চার্ট তৈরি করে দিতে পার। আমরা সেটাও রেকর্ড করাবার ব্যবস্থা নেব।'

মিজান বলল, 'শুকনো মুখে কথা বলতে একদম ভাল লাগছে না!'

টুসি বলল, 'কফি আসছে। তুমি বল।'

এখন যে যত জোরে চেঁচাতে পারে, যার গলায় যত জোর আছে সে-ই শিল্পী হয়ে যাচ্ছে। এই হল-া-চিল-া আর হাঙ্গামার ভিড়ে না অঞ্জলির গান আবার প্যান-প্যানানির মত হয়ে যায়। তাহলে কিন্তু তোদের ইনভেস্টমেন্ট ধুলো হয়ে যাবে!'

'হবে না। অঞ্জলির মত মেয়ের জন্যে আমাদের বাজেট বিশ লাখ টাকা। মিউজিক ডিরেক্টর প্রয়োজনে কিনে ফেলব। আমি গানের গলা চিনি। বুলির পেছনে যা খরচ করেছি এই দুবছরে রিটার্ন পেয়েছি অনেক গুণ!'

মিজান বলল, 'তোদের চিন্তা অনুযায়ী গান হলে ডিরেক্টর কিনতে হবে না। ওরা খুশি হয়েই কাজ করবে। পুরোনো গানের দিকেই ওদের মমতা বেশি। কিন্তু তোদের বাজেটটা খুব বেশি মনে হচ্ছে।'

পুঁজি! এটা হচ্ছে পুঁজির ব্যাপার। যত ইনভেস্ট করব রিটার্ন আসবে তার চার গুণ। এর মধ্যে একটা হবে বুলির সাথে মিক্সড। এটা বাজারে চলবে বুলির নামের জোরে। আর বাকিগুলো যদি পাবলিক খায় তো অঞ্জলির নিজের একটা মার্কেট হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের জন্যে ওর আর ভাবতে হবে না কিছু।'

অল্পক্ষণেই কফি চলে আসে। মিজান কফি খেতে খেতে ভাবে। অঞ্জলিকে রাজি করানোটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। রশিদ অনেক বলে কয়ে

রাজি করাতে পেরেছিল। এখন অবশ্য রশিদ নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'টুসি বলল বেশি ভাবাভাবির সময় নেই। গান জানা না থাকলে সেগুলো গলায় তুলতে হবে। স্টুডিওতে এসে মহড়া দিতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। সামনে রোজার ঈদ আসছে। সেই সময়টাতে ক্যাসেট আর সিডিগুলো বাজারে ছাড়ব। তুমি কফি খেয়ে বিদেয় হও। আমার আবার ছ'টার দিকে ডেলিগেট ফেস করতে হবে। পারলে দু একদিনের মধ্যেই অঞ্জলির সাথে কথা-বার্তা শেষ করে ফেল।'

'দেখি।' বলে, মিজান উঠল।

টুসি বলল, 'দেখি বললে হবে না। কাজটা তোমাকেই করতে হবে!'

আচ্ছা।

টুসি একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার নামের নিচে একটা সাইন করে যাও!'

মিজান বলল, 'কি এটা?'

'এগ্রিমেন্ট।'

মিজান কিছু না পড়েই সাইন করে বেরিয়ে আসে।

পরদিন বিকেলের দিকে অঞ্জলি তো তাকে দেখে অবাক। 'এ কি? না চাইতেই মেঘ!'

'না চাইলেই তো ধরা দেয়। চাইলেই বরং বাঞ্ছিত জিনিসটা দিনদিন দুরে সরতে থাকে।'

'বাহ্! কবি হতে চললেন নাকি?'

বোঝাই যায় অঞ্জলি খুব খুশি হয়েছে তার আসাতে।

মিজান বলল, 'আরে না! আমি যুগের কথা বলছি। এ যুগে বর্ষাকালে বৃষ্টি না হয়ে নামে শরতে।'

অঞ্জলি টের পায় মেঘেরা সত্যিই সুদুর হিমালয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে বিপুল বেগে। এখন কেবল ধারা বর্ষণের অপেক্ষা।

মিজান বলল, 'আচ্ছা, আপনার কি চা পাতা ফুরিয়ে গেছে?'

অঞ্জলি বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'আগে দেখতে হবে। প্যাকেটটা আছে না সত্যিই ফেলে দিয়েছিলাম!'

তারপর সে দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে চুলোয় চায়ের পানি চড়িয়ে দিয়ে আসে।

অঞ্জলির পরনে কালর মাঝে ছোট্ট-ছোট্ট সাদা বুটির ছাপ দেয়া শাড়ি। ম্যাচ করা কাল ব-াউজ। কালর মাঝে তার সুন্দর মুখশ্রী যেন পদ্ম হয়ে ফুটে

আছে। মিজানের মনে হল কপালে যদি একটা ছোট্ট কাল টিপ হত? চোখে যদি থাকত একটু কাজলের টান? তাহলে হয়ত সে বলতে পারত, ও সুন্দরী তোমার জন্যে হাজার বছর বাঁচতে পারি!

সৃষ্টি ঘুমুচ্ছিল। তার ঘুম ভেঙে যেতেই বিছানা থেকে নেমে মিজানকে দেখতে পেয়ে, 'চাচ্চু!' বলেই ছুটে আসে।

তারপর ছোট্ট দুহাতে গলা জড়িয়ে বলল, 'কখন এলে? আমাকে ডাকলে না কেন?'

'মা মনি, তুমি কি এতক্ষণ ঘরেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছিলাম!'

'আর দ্যাখো, আমি কিনা ভেবেছি এ্যাখনো তুমি স্কুলেই আছ!'

'তুমি এত বোকা কেন? আমার ইস্কুল কি বিকেল পর্যন্ত হয়? সেই সকাল দশটাতেই ছুটি হয়ে যায়। এগারটা পর্যন্ত বসে থাকি আম্মুর জন্য!'

'তাই?'

তারপর সে সৃষ্টিকে বলল, 'আমার কি মাথার সব চুল পেকে গেছে? চুল পাকলে নাকি মানুষ বোকা হয়ে যায়।'

সৃষ্টি মিজানের মাথাটা টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনে। দুটো পাকা চুল দেখতে পেয়ে বলল, এম্মাগুদাখো দ্যাখো চাচু, তোমার দুটো চুল পেকে গেছে!'

মিজান দুচোখ বড়বড় করে বলল, 'তাহলে উপায়? আমার চুল পেকে গেলে তো আমার সব বুদ্ধি চলে যাবে!'

সৃষ্টি বলল, 'আমাদের ইস্কুলের দারোয়ান আঙ্কেল মাথায় মেন্দি লাগায়। মেন্দি লাগালে আর চুল পাকে না!'

'তোমাদের মেন্দিগাছ নাই কেন? আমি কোথায় মেন্দি পাব?'

মেয়েটা একটু চিন্তায় পড়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ ভাবল।

তারপর বলল, 'আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করব। ওদের কারো বাড়িতে মেন্দিগাছ থাকতেও পারে।'

দুজনের আলাপের এক ফাঁকে অঞ্জলি চা করে নিয়ে আসে।

মিজান চা খেতে শুরু করলে সৃষ্টি বলল, 'তুমি চা খাও, আমি চোখ মুখ ধুয়ে আসি।'

'কেন?' মিজান জানতে চাইল।

'তাও জানো না?'

মিজান মাথা নাড়ে।

ঘুম থেকে উঠলেই তো দাঁত ব্রাশ করতে হয়। চোখ-মুখ হাত-পা ধুতে হয়!'

কথাগুলো বলে, সৃষ্টি আর দাঁড়াল না। বাথরুমের দিকে যায় হয়ত।

অঞ্জলি বেশ সহজ ভাবেই একটা মোড়া টেনে মিজানের সামনে বসে বলল, 'আবার কি উপকার করবার জন্যে এসেছেন?'

মিজান চা খাওয়া শেষ করে বলল, 'উপকার কিনা আমি বলতে পারব না। তবে বুলি আর টুসি আপনার গান শুনে খুব খুশি!'

তারপর একটা মিথ্যে যোগ করে বলল, 'আপনি চেষ্টা করলে নাকি রেডিও টিভিতে চান্স পেতে পারতেন।'

অঞ্জলি হেসে বলল, 'চান্স পেতে পারতাম মানে? চান্স তো পেয়েই গেছিলাম! অডিশনে পাশ করে রেডিওতে দুটো আর টিভিতে একটা প্রোগ্রাম করেছি!'

'বলেন কি?'

মিজান মনেমনে ভাবল, রশিদ এই কথাটা কখনো বলেনি।

অঞ্জলি আঁচলে মুখ মুছে বলল, 'মেয়েটার জন্মের পর আর সুযোগ পেলাম না। একা মানুষ! বাচ্চা সামলাব না প্রোগ্রাম করব? ভেবেছি, মেয়ে বড় হলে আবার শুরু করব।'

'মেয়ে তো এখন বড় হয়েই গেছে। শুরু করছেন না কেন?'

'এখন তো আরো সমস্যা। সব বুঝেও কেন এ কথা বলছেন?'

'বুঝেই বলছি। আপনাকে তাহলে বলেই ফেলি। আসলে আজ এসেছি এ কথাই বলতে। টুসি আর বুলবুলি আপনার গান রেকর্ড করাতে চাচ্ছে।'

অঞ্জলির যেন বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না। বলল, 'ওরা কেন সেধে আমার পেছনে টাকা খরচ করবে?'

'করবে। প্রোফিট থাকলেই তো মানুষ ইনভেস্ট করে!'

'আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না। আর এখন আমাদের দেশে যে ধরণের গান হচ্ছে তেমন ধুম-ধাম গান আমাকে দিয়ে হবে না!'

'তেমন গান নয়। কিছু ফোক আর কিছু পুরোনো দিনের গান। ব্যাস!'

'আপনি তো দেখছি ভালই এগিয়ে আছেন!'

আরে আমিও তো একজন পার্টনার। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে মিজান বলল, এই যে দ্যাখেন, টুসি এটা দিয়েছে। শুধু ওর সাথে কানেক্টেড থাকবার জন্য।'

অঞ্জলি বলল, 'আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু রিহার্সেল আর স্টুডিওর পেছনে সময় দেবো কিভাবে?'

মিজান বলল, 'দরকার হলে স্টুডিও আপনার বাড়িতেই বসাব।'

অঞ্জলিকে কিছুটা বিষন্ন দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি রাজি আছি!'

সঙ্গে সঙ্গেই মিজান টুসিকে ফোন করে বলল, 'টুসি আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি। অঞ্জলি রাজি হয়েছে!'

ওপাশ থেকে টুসি বলল, 'ফোনটা ওকে দাও।'

মিজান বসে থেকে কিছুক্ষণ অঞ্জলির হ্যাঁ, হুঁ আর ঠিক আছে শুনল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

ফোনটা মিজনের দিকে বাড়িয়ে ধরে অঞ্জলি বলল, 'আমার টাকা পয়সার দরকার নেই। ক্যাসেট বেরুলেই তো বিরাট একটা ব্যাপার!'

মিজানের রাগ চড়ে যায়। বলে, 'টাকা পয়সা লাগবে না! না খেয়ে গান করতে পারবে?'

অঞ্জলি কিছুক্ষণ বাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকল মিজানের মুখের দিকে।

তারপর বলল, 'ঠিক আছে। টুসি আপা বলল, আমাকে টোয়েনটি পার্সেন্ট দেবে।'

মিজান বলল, 'এটা ওদের সিলেকশনের গানগুলোর জন্য। বুলির সাথে গাইতে হবে। আর আমার সোলো রিমিক্স অ্যালবাম থাকবে। এটা হবে সুপার হিট! এর জন্যে পাবে থার্টি পার্সেন্ট!'

অঞ্জলি আবার একই ভাবে তাকাল মিজানের দিকে। মনে মনে ভাবল, মানুষটার মাথা কি গরম হয়ে গেছে? নাকি উত্তেজিত হলে সম্বোধণের ক্ষেত্রে এক ডিগ্রি নেমে যায়?

কিন্তু মিজান বুঝতে পারল না যে, অঞ্জলি কেন তার দিকে অমন ভাবে তাকাচ্ছে।

অঞ্জলি হেসে বলল, 'থার্টি পার্সেন্টে কত আসতে পারে?'

মিজান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, 'মনে করেন আমাদের দেশে তেরকোটি মানুষ। যদি হাজারে একজনও একটা করে ক্যাসেট কেনে, তাহলে বিক্রি হবে এক লাখ ত্রিশ হাজার। হোলসেল যদি প্রতি ক্যাসেট পনের টাকা করে হয়, তাহলে তার থার্টি পারসেন্ট আসছে পাঁচ লাখ পঁচাশি হাজার টাকা। আরো কম যদি বিক্রি হয়, যেমন চারভাগের এক ভাগ, তাহলে হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে এক লাখ

চলি-শ হাজারেরও উপরে।'

'বেশ, আপনার সিলেকশন মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর আর কঠিন গানগুলোই হবে। আমি সে জন্যে এক পয়সাও নেব না।'

'এখন তো বলছেন নেবেন না! যখন শুনবেন সেটা বাংলাদেশের বেস্ট সেলার, তখন ঘরে বসে শুধু কপাল চাপড়াবেন!'

'তা করব না। তবে কমপক্ষে একমাস সময় দিতে হবে আমাকে। আপনার লিস্ট আমার হাতে পাবার পর একমাস।'

মিজান বলল, সময় দু মাস। শুধু তাই না। পাবেন ডিরেক্টর। পাবেন সব ধরণের যন্ত্রের ওপর দক্ষ ওস্তাদদের। যাঁরা আপনার সাথে সঙ্গত করবেন। ভুলগুলো তাঁরাই শুধরে দেবেন। আর পাবেন জাপানি ক্যাসেট পে-য়ার। ডিজিটাল সাউ□সিস্টেম।'

'আরেক কাপ চা দেব?'

অঞ্জলি নিজের খুশিটাকে এভাবেই প্রকাশ করল। আর এটাই তার কাছে একমাত্র মাধ্যম বলে মনে হল।

'তাহলে খুবই খুশি হব!'

মিজানের এ মুহূর্তে চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু অঞ্জলির মনের অবস্থাটা সে বুঝতে পারছে। তাই সেই খুশিখুশি ভাবটা নষ্ট করতে চাইল না।

একাএকা মিজান হাতের ফোনটার দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে। ভাবল টুসিকে আবার ফোন করবে কিনা। আর কি আশ্চর্য! ফোনটা তখনই বেজে উঠল।

টুসিই ফোন করেছে। মিজান বলল, 'আমি এই মাত্রই ভাবছিলাম তোকে ফোন করব কিনা।'

'কেন?'

টুসি জানতে চাইল।

'ভাবছিলাম আমাকে হয়ত এই মুহূর্তে তুই খুঁজছিস।'

'সত্যিই! তুমি এখন কোথায়?'

'রূপনগরে।'

'এখনো কি করছ ওখানে?'

'আমার চার্টটার কথা বলছিলাম। আর কি কি সুবিধা সে পাবে এই সব আর কি!'

'তাহলে চলে আসছ না কেন?'

‘ও যে চা বানাতে গেছে। চা টা খেয়েই যাই।’

‘এত ও সে করছ কেন? শুনেছি আগে ভাবিই বলতে। নাকি প্রেমে পড়ে গেছ?’

‘সেই প্রথম দিন থেকেই তো তার প্রেমে মজে আছি!’

‘তোমাকে প্রেম করাচ্ছি! ওখান থেকে সোজা আমার এখানে চলে আসবে! বুলিও আসছে।’

মিজান ফোন বন্ধ করতেই দেখল অঞ্জলি চা নিয়ে আসছে।

অঞ্জলি বলল, ‘কার সাথে কথা বললেন।’

‘আমার বস। টুসি।’

‘উনি না আপনার পার্টনার?’

‘পার্টনার হলেও আমাকে নানা রকম হুমকি ধামকি দিয়ে চালাচ্ছে তো!’

তারপর কাপ হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ‘আজকের চা বানাতে একটু মনও দিয়েছিলেন মনে হয়। চমৎকার হয়েছে!’ মনে মনে ভাবল, চা বানাতে নিষেধ না করে ভালই করেছে।

সৃষ্টি ছুটে এল হঠাৎ। মিজানের সামনে এসে বলল, ‘ওহ চাচু! তুমি আছ? আমি তো ভয় পেয়ে গেছি তুমি চলে গেছ ভেবে!’

‘এতক্ষণ কি করছিলে?’

‘বাথরুমে ছিলাম!’

তারপর খানিকটা দুরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি না একটা ছবি এঁকেছি!’

‘কি ছবি মা মনি?’

‘একটা গ্রাম। পাশের নদী দিয়ে পাল তোলা নৌকা যাচ্ছে। মাঠের সব খানে পাকা ধান। গ্রামের পথ দিয়ে একটা বউ নদী থেকে পানি আনছে।’

‘তাহলে তো খুব সুন্দর হয়েছে মনে হয়!’

‘আমি নিয়ে আসছি। তুমি এক্ষুনি চলে যাবে না কিন্তু!’

‘আচ্ছা!’ মিজান হেসে বলে।

হঠাৎ করেই যেন মিজানের কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। সামনে বসে থাকা অঞ্জলিও কেমন চুপচাপ।

সৃষ্টি নিজের আঁকা ছবিটা নিয়ে আসে।

মিজান তা দেখে বলল, ‘তুমি এঁকেছ?’

‘হ্যাঁ!’

‘যাহ্!’

‘সত্যি!’

‘তাহলে আরো সুন্দর! সত্যিই বড়দের আঁকা ছবির মতন।’

অঞ্জলি এরই মাঝে বলল, ‘একা মানুষ আমি। গান গেয়ে চাকরি করে মেয়েকে দেখা শুনা করেও অনেকগুলো সময়ই আমার বেঁচে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ি, নয়তো গান শুনি। ঘুম আসতে চায় না। সময়গুলো আর কাটতে চায় না!’

তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলল, ‘অনেক দিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি।’

মিজান জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় অঞ্জলির দিকে। অঞ্জলির চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ। মাথাটা একটু ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। হয়ত ভেতরে ভেতরে চলছে কোনো একটা অসম যুদ্ধ। কিংবা যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতি।

‘কি বলতে চাচ্ছিলেন, তা না বললে বুঝব কি করে?’

‘আপনি তো একা মানুষ। মেসে গিয়ে শুয়ে থাকবেন একাএকা। আজ রাতটা কি এখানে আমাদের সাথে থেকে যাওয়া যায় না? আগামী কাল তো শুক্রবারই। ছুটির দিন আছে!’

অঞ্জলির মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ে।

মিজানের বুকটা আচমকাই ধড়াস করে উঠল। নৈশ যন্ত্রণারা কি দীর্ঘদিন পর সংঘবদ্ধ হয়ে চারদিক থেকেই আক্রমণ করে বসল ওদের? ওরা কি এমনই কোনো একটা পরিবেশের জন্যে ওত পেতে ছিল? সে এখন কি করবে? অঞ্জলির কি ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে অবেলায়? নিজের একাকিত্বের সাথে কি আর যুঝতে পারছে না?

সে বিপাকে পড়ে যায়। বিধাতা যদি দুজনকেই ভুল মানুষের সঙ্গী করে পাঠাবেন, তো কী প্রয়োজন ছিল এমন নিষ্ঠুর একটা তামাশা করার? অবশ্য কাতরতা মিজানেরও ছিল। আছে। তবে আগে ভাবতে হবে অঞ্জলির এমন পরিবর্তন আকস্মিক না দীর্ঘ সময় পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে চিন্তা চেতনা দিয়ে আবিষ্কারের ফসল? একজন অসহায় মানুষ যখন আরেকজন নিঃস্ব মানুষের উপর নির্ভর করতে চায়, তখন কি করা উচিত? এ যে মায়া-মরিচীকা! নিনিকে সে কী সান্ত্বনা দেবে? তবে কি সে আবার মোহাবিষ্ট হতে চলেছে? একবার মোহগ্রস্থ হয়ে মৌরীকে বুকে তুলে নিয়েছিল। সেই ক্ষত আজো মাঝে মাঝে পেঁকে উঠে কষ্টের পুঁজ আর দুর্গন্ধ ছড়ায়। তখন নিদারুণ যন্ত্রনায় নিজের এই শরীর-প্রাণ কোনোটার জন্যেই মমতা থাকে না। আর সে ভয়েই সে মাঝেমাঝে ডুবে যায় সোনালী গরলের অন্তহীন অতলে।

সৃষ্টি বলল, 'চাচু! তুমি তো আমাদের সাথেই থাকতে পার। আমি তোমার আর মা মনি দুজনের মাঝখানে ঘুমুতে পারতাম। আমাদের সব ভয় চলে যেত।'

সৃষ্টির কথায় সে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে যেন। কিন্তু মুহূর্তেই নিজের সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারল সে। অঞ্জলিকে আরো ভাবতে সময় দেয়া উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা মনি, আজকে তো পরব না। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সেগুলো শেষ করেই তোমাদের বাড়ি চলে আসব। আর যাব না!'

তারপর মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, 'আমার দিক থেকে কিছু সমস্যা আছে। তবে আমরা পোড় খাওয়া মানুষ। আমাদের বুঝতে হবে যে, জীবনের রূঢ়তা আমাদের কাউকে ক্ষমা করেনি। কাজেই ভুলের মাশুল সারা জীবন না দিয়ে, ভুল না করাটাই সমিচীন।'

অঞ্জলি আবার সহজ হয়ে উঠতে পারল। বালিয়াড়িতে যেমন এক টুকরো চাঁদ বিপন্ন মানুষকে বরাভয় দেয়, সেও দেখতে পাচ্ছে একটু আশার ফুলকি। মিজান তাকে ফিরিয়েও দেয়নি আবার আবেগাক্রান্ত হয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেনি। সুযোগ পেয়েও সেটার অপব্যবহার করেনি। এতে করে পুরুষ মিজান অঞ্জলির কাছে সত্যিকার পুরুষ মানুষ হয়ে উঠলো যেন।

মিজানের কথার জবাবে অঞ্জলি কিছু বলল না। কেবল সৃষ্টিকে আরো মমতা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

'কয়েক দিনের মধ্যেই বুলবুলি আসবে।' মিজান বলল। 'আমি চেষ্টা করব যত দ্রুত সম্ভব কাজে লেগে যেতে। যা যা করতে হবে ও-ই বলে দেবে। আপনার দরকার কেবল নিষ্ঠা।'

মিজান বেরোবার আগে অঞ্জলির বুকের কাছে লেপ্টে থাকা সৃষ্টির মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেয় শুধু।

ছয়

সেদিন অঞ্জলির বাড়ি থেকে আসার পর টুসি আর বুলির কথা অনুযায়ী মালিবাগের সেই ঘরটা ছেড়ে দিয়ে ইস্কাটনেই একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে নিল মিজান। তার এই ছন্নছাড়া জীবন যাপনে ওরা দুজনই ঘোর বিরোধী। উন্নত জীবন যাপনের জন্যে যত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে তা দিয়ে এক সপ্তাহের ভেতরেই ফ্লাটটাকে ভরে ফেলল। বুলি ড্রয়িং রুমের এক প্রান্তে গিয়ে তেরছা

ভাবে একটু পেছনে হেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত দিনে তোমার আরামে থাকবার একটা ব্যবস্থা হল। এখন বাকি থাকলো কি? দুটো গাছ লাগানো টবও লাগবে।'

তারপর কোমরে দুহাত রেখে বুলি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

টুসি বলল, 'মিজানের বউ থাকলে অবশ্য বেডরুমটারও একটা ব্যবস্থা করা যেত।'

বুলি কিছুটা রেগে বলল, 'ওর বউ নেই ভাল হয়েছে! মেয়েদেরকে ও কতটুকু বোঝে? না কোনোদিন বুঝতে পেরেছে?'

মিজান বলল, 'এটা কি তোর অভিজ্ঞতা থেকে বলছিস?'

'যে কোনো মেয়ে তোমাকে এক সপ্তাহেই বুঝে ফেলতে পারবে। কিন্তু তুমি একটা স্টুপিড বলেই সেটা তোমাকে দিয়ে হল না!'

'তোর ঝগড়া থামা তো!' টুসি একটা হাত নেড়ে বলল।

তারপর আবার বলল, 'কিছু দিন যাক। তখনই চোখে লাগবে কোনটা কোনটা নেই।'

একদিন রেস্ট নিয়ে রীতিমত অফিস করতে লাগলো মিজান। টিউশানিগুলো একেএকে ছেড়ে দিতে লাগল সুবিধা মত। এরই মাঝে একদিন রেকর্ডিং সেরে অঞ্জলি হাজির হল সৃষ্টিকে নিয়ে। বলল, 'আপনার নতুন আবাস দেখতে এলাম। নিয়ে যাবেন না?'

'যাবেন?'

মিজান কিছুটা অনিশ্চয়তার সুরে পাল্টা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে মারে।

হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত করে বলল অঞ্জলি, 'যাব বলেই তো ঠিক করেছি!'

মিজান ভাবল, 'অঞ্জলি কি আজ কিছু ঘটবার অপেক্ষায় আছে? নাহ্। বেচারিকে আর বেশি দিন অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। আজকাল তার নিজেরও খুব খারাপ লাগে। নিঃসঙ্গ রজনী ফুরোতেই চায় না। মাঝ রাতের দিকে প্রায়শঃ ঘুম ভেঙে যায়। আর ঠিক তখনই আরো বেশি করে অনুভব করে নিজের একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতা।'

ঘুরে ঘুরে মিজানের ঘর দেখে অঞ্জলি। টুসি খুব আইসক্রীম খেতে পছন্দ করে বলে ফ্রিজে আইসক্রীম কিনে রেখেছে মিজান। দুটো আইসক্রীম বের করে মা মেয়েকে দিয়ে বলল, 'ঘরের খাই না বলে অন্য কিছু দিতে পারলাম না। জানেনই তো, বাইরে বাইরে খাই। আইসক্রীম গলার কাজের

জন্যে খুবই খারাপ!'

সৃষ্টি বলল, 'আমাকে দেবে না চাচু?'

'হ্যাঁ মা মনি! শুধু তোমাকেই দেব!'

ঘর সাজানো দেখা শেষ করে অঞ্জলি বলল, 'খুবই সুন্দর হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে কয়েক দিন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে যাই। কিন্তু ওদিকে বাড়িটা ইনসিকিউরড থাকবে বলে সাহস পাই না।' বলে, মিজানের মন্তব্য শুনবার অপেক্ষা করল যেন।

কিন্তু মিজানের নিরবতা দেখে, কণ্ঠে আরো মাদকতা ছড়িয়ে বলে, 'আপনি তো যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন। আসেন না একদিন!' বলে, সোফায় নিজকে ধপাস করে ছেড়ে দেয় অঞ্জলি।

অঞ্জলির চোখে মুখে আর্তি ফুটে উঠতে দেখল মিজান। বলল, 'নিরাশ হতে নেই। এখন আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসলের চার্ট তৈরী করছি।'

'কি কি তুলেছেন দেখাবেন না?'

মিজানও তার মুখোমুখি বসে বলল,' আগে বলেন অনুপ ঘোষালের গাওয়া "আমি জাগিতে এসেছি রাতি, জাগাতে আসিনি গো, শুধু জাগিতে এসেছি রাতি" গানটা কোনো নারী কণ্ঠে শুনেছেন?

'না তো!'

'আপনি গাইলে কেমন হবে?'

'চমৎকার!'

'এমন অনেকগুলো চমৎকার গান তুলব। কিছু থাকবে আমাদের দেশীয় সিনেমার গান। কিংবা আবদুল জব্বারের গাওয়া "তারা ভরা রাতে" গানটাও কোন মেয়ে গেয়েছে বলে শুনিনি।'

'আমিও।'

'আমার চার্টের প্রথমেই রেখেছি, মডেল সাদিয়া ইসলাম মৌ এর বাবার সেই বিখ্যাত গান "তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মত আমার মনে জ্বলবে"।

অঞ্জলি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'মৌ? তার বাবা গান করতেন নাকি?'

মিজান হেসে বলল, 'বোকার মত একটা কথা বললেন। সাইফুল ইসলাম সাহেবের নাম শোনেন নাই?'

'নাম তো শুনেছি। কিন্তু উনি যে মৌ এর বাবা জানতাম না!'

মিজান বলল, গানটা অবশ্য ছেলে-মেয়ে মিলে গাইলে আরো ভাল লাগত। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম ভাললাগা গান। খুব ছোটো আমি তখন। ক্লাস টু বা থ্রিতে পড়ি। গানটা রেডিওতে শুনে সে সময়ই মুগ্ধ হয়ে

গিয়েছিলাম। পরে কৈশোরে শিল্পীর নাম জেনেছি।'

অঞ্জলি বলল, 'আপনার ভেতরকার সেই কবি লোকটা আজো হারিয়ে যায়নি।'

মিজানের অবাক দৃষ্টি দেখে আবার বলল, 'আপনার বন্ধুর কাছেই শুনেছি। তার ওপর সেদিন বুলি আপা আর টুসি আপা দুজনেই বলছিল যে, স্টুডেন্ট লাইফে আপনি দেদার কবিতা লিখেছেন। কিন্তু এখন কি তা করেন? তা ছাড়া এমনিতেও শুনেছি কবিরা নাকি সারাজীবনই কবি থেকে যায়। কেউ কাগজে কলমে লেখে। তাদের কবিতা বই হয়ে বেরোয়। আর কেউকেউ প্রকাশ্যে লেখে না, তবে সারাক্ষণই তাদের মননে চলে শব্দের বুনট। যার কারণে ওরা বেশির ভাগই অসুখি আর দুঃখি হয়। ওদের ভাল মত বুঝতে পারে না কেউ।'

মিজান বলল, 'কবি অসীম সাহার একটা কবিতা আছে।'

'কাব্যের নামটা কি?'

'একটা ঈদ সংখ্যায় পড়েছিলাম। আর এত ভাল লেগেছিল যে, ওটা আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছে।'

'কি লিখেছিলেন অসীম সাহা?' অঞ্জলির কণ্ঠে আগ্রহ ঝরে পড়ে।

'লিখেছেন, কবিদের কোন বাড়িঘর নেই / কবিরা থাকেন শূন্যে; / হাছনের মতো গড়ে তোলে ঘর / স্থপতির নৈপুণ্যে। / কবিদের কোন সংসার নেই / কবিরা চলেন ভাগ্যে; / একটি জীবন শুধু কেটে যায় / সন্ন্যাসে, বৈরাগ্যে। তাই মাঝে মাঝে ভাবি সংসারী হয়ে ভুল করেছিলাম আমি। আর আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছিল মৌরী। আমাকে ফেলে চলে যাওয়াটাতে আমি আজকাল দোষ দিতে পারি না। এই যে বলি, আমার প্রাচুর্য ছিল না বলে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এটা আমার চোখে একটা পর্দা ফেলে যাবার চেষ্টা। কবিকে দুঃখ দিতে চায়নি বলে তার এই ছুতো।'

'আপনার ভেতরে আর কত দুঃখ চাপা দিয়ে রাখবেন?' বলে, অঞ্জলি উঠে এসে মিজানের পাশে বসে একটা হাত দিয়ে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরল। পাখি যেমন তার শাবককে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে উপরে পাখা বিছিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি ভাবেই অঞ্জলিও যেন শত দুঃখ আর কষ্টের উৎপাত থেকে আড়াল করে রাখতে চায় মিজানকে।

তারপর অস্ফুটে বলল, 'আমি আছি না! তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব। কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না!'

মিজান অল্প করে হাসল। বলল, 'নিনিও একই কথা বলেছে। আমি

কোন দিকে যাব?'

অঞ্জলি কটাক্ষ হেনে বলল, 'পথে তো কেউ কাঁটা বিছিয়ে রাখেনি!'

মিজান তার স্বপ্নাচ্ছন্ন দু চোখ তুলে ধরে অঞ্জলির দিকে।

অঞ্জলি দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'সময়টাকে ভাগ করে নেব।'

'মেয়েরা কি তার প্রেমিকের ভাগীদার সহ্য করবে?'

'মেয়েদের কতটুকু চেন?'

মিজান বলল, 'এবার কবি কে জি মোস্তফার কথা দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় যে, চির চেনা এই অচেনা পান্থনিবাস / অন্দর মহল থেকে আহ্বান / আসেনা যখন / স্পর্শের বাইরে থাকে / আকাশ ও আগুনের উপাখ্যান;'

অঞ্জলি এবার আরেকটু ঘনিষ্টভাবে চেপে ধরে কানের লতিতে তার ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'আজ কি হয়েছে তোমার? মন কি এতটাই খারাপ? আমার উপস্থিতির কি কোনো প্রভাব নেই?'

মিজান খানিকটা সরে অঞ্জলির দিকে ফিরে বলল, 'আছে বলেই তো এমন শব্দের ফুলঝুরি। তবু শব্দহীন নির্জন সৈকতে, তোমার নিঃশ্বাসের শব্দাবলি, মনে হয় হৃদয় নিঃসৃত একেকটি দীর্ঘশ্বাস!'

অঞ্জলি কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মিজানের হাসিমাখা দুঃখি মুখটার দিকে।

মিজান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আর কিছু না হোক, অন্ত ত দুঃখ পাবার কিছু নেই। কত সহজে আজকে আমরা আপনি থেকে তুমিতে চলে এলাম! আর এভাবেই নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যে!'

অঞ্জলি বলল, 'কোথায় যাব?'

'মেয়েকে নিয়ে পার্কে যাও না কত দিন হল?'

'তাও তো অনেক দিন হয়ে গেল।'

'তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে না খোলা আকাশের নিচে আমাদের নৈকট্যকে উদযাপন করবার?'

অঞ্জলি হেসে বলল, 'কবিকে জাগিয়ে দিয়েও তো ভুল করলাম!'

'কেমন ভুল?'

গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চায় মিজান।

'এ মিজান যেন অন্য কেউ। সব কথাই কেমন কঠিন কঠিন!'

দরজায় তালা দিয়ে সৃষ্টিকে কোলে তুলে নিতেই মিজানের গলা জড়িয়ে ধরল সে। অন্য দিনগুলোর মত ছটফট করল না। তের তলার সিঁড়ি

বারান্দার ফাঁক দিয়ে পশ্চিমাকাশ তার লালিমায় ওদের সাদর সম্ভাষণ জানায়।

শুক্রবার সকালের দিকে নিনির সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে মিজান দেখল দেয়ালে দেয়ালে অঞ্জলি আর বুলির যুগল ছবির পোস্টার। মনটা তার খুশি হয়ে উঠল। বিকেলে রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে এই যুগলের গানের ক্যাসেট আর সিডির প্রকাশনা উৎসব আছে। টুসি আয়োজন করেছে বিরাট করে। ওয়ান্ডার সাইনের বিজ্ঞাপণী বুলি "প্রচারেই প্রসার" কথাটাকে নিজের করে নেবার প্রচেষ্টায় এই ব্যাপক আয়োজন।

রিকশায় বসেবসে অঞ্জলির জন্যে তৈরী করা লিস্টটা মনে মনে আরেকবার নিরীক্ষা করে দেখছিল মিজান। হঠাৎ তার মনে পড়ল অনুপ ঘোষালের আরেকটা গান। "শুনছ সখি, শুনছ সখি / শিখছি খানিক চোখেরই ভাষা / শিখছি যত বাড়ছে তত / আমার শিশু ভালবাসা।"

পকেট থেকে নোটবুকটা বের করে গানের কথাগুলো সে টুকে রাখল।

কাঁটাবন বাঁয়ে রেখে বাটা সিগন্যালের দিকে যাবার সময় মনে পড়ল আরেকটা গান। গেয়েছেন সুবির নন্দী মনে হয়। শিল্পীর নামটা নিয়ে সে সব সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। শিল্পীর নামে কিবা যায় আসে! বেশির ভাগ মানুষই শিল্পী কে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গানের কথা, সুর, কাব্যের বাঁধুনি আর কণ্ঠস্বর সুন্দর হলে সেটাই মনে রাখে বেশি।'

নোট বইটা তার হাতেই ধরা ছিল। সে লিখল, "পাখিরে তুই দুরে থাকলে / কিছুই আমার ভাল লাগে না।"

নোটবইটা পকেটে রাখবার আগে দেখল যে, ঠিক চৌদ্দটা গান হয়ে গেছে। সে ঠিক করল পুরো একটা সপ্তাহ এই লিস্টটা নিয়ে ভাববে। আরো কোনো সুন্দর গান এ্যাড রিমুভ করতে হয় কিনা। তারপরই সেটা নিয়ম মাফিক তুলে দেবে টুসির হাতে।

গেটের সামনে এসে রিকশা ভাড়া মিটিয়ে সে দরজার কল বেলে হাত রাখে।

কিছুক্ষণ পর গেটের ফাঁক দিয়ে উর্দি পরা সিকিউরিটি গার্ড মুখ বের করে মিজানকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়ে জানতে চাইল, 'কাকে চাই?'

মিজান সন্দিহান। সে চারিদিকে তাকিয়ে শেষে গেটের নাম্বার দেখে বলল, 'আমি ঠিক বাড়িতে এসেছি তো?'

লোকটা বলল, 'যে নাম্বার দেখছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে ভুল করেন নি।'

'আগে তো সিকিউরিটি ছিল না।'

'আমি জয়েন করেছি এক সপ্তাহ হল। আপনার নাম বলুন। আমি ফোনে জিজ্ঞেস করে দেখি। পারমিশান হলে আপনি যেতে পারবেন।'

নিজকে খুবই অপমানিত মনে হল মিজানের। একবার ভাবল ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু নিনি বা তিন্নি এরাই বা ভাববে কি? সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি আজ চলেই যাই। আরেক দিন আসব।'

'তবুও আপনার নামটা বলতে হবে।'

'কেন বলতে হবে?' মিজান রেগে উঠতে গিয়েও রাগল না।

'কে আসছে কে যাচ্ছে সেটা আমার কাছে রাখা একটা খাতায় এন্ট্রি করে রাখতে হয়। সপ্তাহ শেষে ধানমন্ডি থানা থেকে লোক আসে। চেক করে যায়।'

মিজান নিজের নামটা বলতেই সিকিউরিটি শশব্যস্ত হয়ে গেট খুলে দিয়ে বলল, 'সরি স্যার! নামটা আগে বললেই পারতেন। নিনি ম্যাডাম আপনার কথা বলে রেখেছিলেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সে ভাবল, তাহলে নিনি আগেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছে! ভেতরে ঢুকে তার মনের রাগটা চলে গেল আপনা আপনিই।

ড্রয়িং রুমের দরজা নিনিই খুলে দিল। নিনির পরনে আজ একটা গ্রামীন চেক শাড়ি। চুলগুলো খোলা। একরাশ কালো মেঘ যেন সারা পিঠময় ছড়িয়ে আছে। আগে কখনো নিনিকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেনি সে। আজ শাড়ি পরবার কারণে হয়ত নিনির প্রকৃত রূপটাও ফুটে উঠেছে। আটপৌরে মিষ্টি চেহারার বউদের মত লাগছে। মিজান মনেমনে ভাবল, দেখতে এমন মেয়েদেরই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

মিজানের মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে নিনি বলল, 'আরে মিজান! আপনি এত দেরি করলেন কেন?'

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মিজান জানতে চাইল, দেরি করে কি অসুবিধায় ফেললাম?'

আমাদের উপর দিয়ে কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে! এমন একটা বিপদের দিনে আপনাকেই কাছে পেলাম না!'

'আমারও তো আফসোস হচ্ছে এ জন্যে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানতে পারি?'

'দুলাভাইকে লাস্ট উইকে এয়ার পোর্ট থেকে পুলিশ এ্যারেস্ট করে

থানায় নিয়ে গিয়েছিল।'

'কেন?'

'পুলিশ বলছে দুলাভাই ব্যাগে করে অবৈধ জিনিস নিয়ে এসেছেন। তাকে কাস্টমস অফিসাররা এয়ারপোর্ট পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেয়।'

মিজান চুপ করে থাকে।

নিনি বলল, 'পেপারে নিউজ হয়েছে। আপনি দেখেন নি?'

'না। আমি কেবল হেডলাইনগুলো দেখি। ডিটেইল কখনো পড়ি না। কিন্তু অনেক সময় দেখেছি হেরোইনের প্যাকেটও পরে আটার গুড়ো হয়ে যায়। কিন্তু আমি ভাবছি উনার ব্যাগে অবৈধ জিনিস কেন?'

'দুলাভাই তো এখনো বলছেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না!'

মিজান বলল, 'ব্যবসার কাজে উনি তো প্রায়ই বিদেশে যান। কিসের ব্যবসা তার?'

'কেন? ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট। আমাদের দেশ থেকে চিংড়ি, কাঁকড়া এক্সপোর্ট করেন। আর বিদেশ থেকে আমাদানী করেন রঙ, এ্যালুমিনিয়াম, কসমেটিক্স।'

'তাহলে কেউ শত্রুতা করে তার ব্যাগে এসব ঢুকিয়ে দিয়েছে?'

'আপা কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, দুলাভাইয়ের নাকি অনেক লোভ। টাকা আর মেয়ে মানুষ। এ দুটোর জন্যে উনি এমন কোনো কাজ নেই যে করতে পারেন না!'

'তাহলে আপনার আপা কেন এমন একটা জঘন্য লোকের সাথে আছেন?'

নিনি হেসে বলল, 'দায়ে পড়ে!'

মিজান গলার স্বর নিচু করে বলল, 'ঘরে আপা আছে?'

'আপা নেই এক সপ্তাহ ধরে। টনিকে নিয়ে চলে গেছে মুন্সীগঞ্জে। সেখানে আপার নামে একটা বাড়ি আছে। যাবার আগে দুলাভাইয়ের সাথে ফাটাফাটি ঝগড়া করেছে! বলেছে চরিত্র না বদলালে আর কোনোদিন ফিরবে না!'

'আপনার দুলাভাই কোথায়?'

'জার্মানি।'

'কবে ফিরবে?'

নিনি তার দু ঠোঁট ভেঙে চুড়ে বলল, 'মনে হয় দুলাভাই পালিয়েছে!'

‘পুলিশ কি এমনি এমনি ছেড়ে দিল?’

‘আপনি দেখছি আমার চেয়েও বুদ্ধু! আরে দুলাভাইয়ের সাথে কি কোনো রুই-কাতলা নেই ভাবছেন? ওইসব রুই-কাতলাদের কারণেই বিমানে করে মানুষ এক-আধকেজি আটার স্যাম্পল নিয়ে আসে। কিছু বুঝতে পারছেন? পুলিশ কি করবে? আপনি যদি কারো নাম করে এক্ষুনি ধানমন্ডি থানায় ফোন করে গলার স্বর মোটা করে বলেন, ‘ওই ওসির বাচ্চা! কালুরে অহনই ছাইড়া দে! নাইলে সকাল দশটা বাজনের আগেই বান্দরবান পোঁছায় যাইবি! দেখবেন ওসি কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে। আর কালু নামের চোর কিংবা হাইজ্যাকার বা সন্ত্রাসীটা হাসতে হাসতে হাজত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।’

‘পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে এতটা গাধা ভাবছেন কেন?’

‘গাধা না। ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। ফোনে দিনরাত ধমক খেতে খেতে ওদের মেরুদন্ড নামের কাঠামোটা আজ ঘুণে খাওয়া লাঠির মত হয়ে গেছে। চাকরির মায়া, এই ঢাকা শহরের এত চাকচক্য, সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে কে যেতে চাইবে বলেন? দেশ চালায় বোয়াল-চিতলরা। সরকার ওদের কাছে পুঁটি মাছ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুলিশ তো আরো অনেক পরের স্টেজে!’

এত জটিল কথা শুনতে ভাল লাগছিল না মিজানের। সে বলল, ‘আপনার অসুখ সেরেছে?’

‘পুরোপুরি সারেনি। ওষুধ খাচ্ছি। তবে, আজ এখনো জ্বরটা আসেনি।’

‘তাহলে ফোন ধরেন না কেন? কাজের মেয়েটাও কি নেই?’

‘ফোন ডেড। কমপে-ন করেও কাজ হচ্ছে না।’

‘থানা থেকে আমাদের বাড়ির ওপর নজরদারি হচ্ছে। কেউ যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে সে জন্যে হয়ত কানেকশান কেটে দিয়েছে। সবই লোক দেখানো!’

তারপর বলল, ‘কাজের মেয়েকে আপনার কি দরকার?’

‘একটু চা খেতাম।’

‘ও গেছে তার মায়ের সাথে দেখা করতে। আদাবর। আসতে বিকেল হয়ে যাবে।’

মিজান বলল, ‘ফাটা কপাল! ভেবেছিলাম চা খেতে খেতে দাওয়াত দেব, তাও হল না!’

‘চা আমি করে আনছি। কিন্তু কিসের দাওয়াত?’

নিনির চোখে উত্তর পাবার প্রত্যাশা উপচে পড়ে।

‘অঞ্জলির কথা বলেছিলাম না?’

‘হ্যাঁ। ওই উইডো মেয়েটা? কি হয়েছে তার?’

‘ওর আর বুলির গানের ক্যাসেটের আজ প্রকাশনা উৎসব। রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে।’

‘কখন?’

‘বিকেলে।’

‘যাব। নিয়ে যাবেন?’

‘পুলিশ ফলো করবে না?’

‘করলে করবে। আমরা তো আর চোর না!’

‘এত বড় একটা ফাঁকা বাড়িতে একাএকা আছেন। ভয় করছে না?’

‘গেটে তো সিকিউরিটি আছেই।’

‘ও একা কি করবে? আজকাল পুঁচকে ছেলেদের কাছেও বিদেশি আর্মস থাকে।’

‘গেটের লোকটার কাছেও স্টেনগান আছে।’

মিজান বলল, ‘তাহলে আমি আর ভয় পাচ্ছি না!’

নিনি হেসে বলল, ‘তাই বলেন!’

‘আসেন। আমি চা করছি।’

‘কোথায়?’

‘কিচেনে।’

‘আমি?’

‘এখানে একাএকা কি করবেন? উঠেন তো!’ বলে, মিজানের হাত ধরে টান দেয় নিনি।

মিজান উঠতেই নিনি আবার বলল, ‘আপনি তো ভারি অদ্ভুত!’

‘কেমন?’

‘একটা যুবতী আপনাকে তার পাশে আসবার জন্যে ডাকছে আর আপনি কিছু না ভেবেই না করে দিলেন? সুন্দরী নারীর সঙ্গ আপনার ভাল লাগে না? এই লোভটা আপনার নেই?’

‘আছে। তবে আপনাকে যেই সুন্দরী বলে থাকুক, একটা খুঁত কিন্তু ধরতে পারেনি।’

‘কি সেটা?’

‘আপনার ঠোঁট দুটো। লিপস্টিক না ঘঁষলে মনে হয় একটু আগেই

অনেকগুলো নীলরঙের মাছি সেখানে বসে ছিল।'

'অ্যাক থো! ঘেন্না ধরিয়ে দেবেন না বলছি!'

মিজান বলল, 'ঠিক আছে। আর লোভের কথা বলেছেন না? কিচেনে চলেন। বলছি।'

মিজান নিনির পিঠে হাত রেখে তাড়া দেয়।

কিচেনে ঢুকে চুলো জ্বালিয়ে নিনি পানির পাত্র বসিয়ে বলে, 'এবার কি বলছিলেন বলেন।'

মিজান কেবিনেটের কংক্রিটের তাকের উপর পা ঝুলিয়ে বসে চার দিকটা দেখে বলল, 'আমি যে ফেরেশতা বা মহাপুরুষ নই, সেটা আপনি ভাল করেই জানেন। আমি সাধারণ মানুষ। লোভ আমারও আছে। তবে কথা হচ্ছে লোভটা কি ধরণের!'

নিনি অবাক হয়ে বলে, 'লোভের আবার ধরণ কি?'

'আরে ম্যাডাম, কথাটা তো এখানেই!'

নিনি বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে দরজায় হেলান দিয়ে বলল, 'বলেন তো শুনি!'

'লোভ হচ্ছে দু ধরণের। একটা হচ্ছে পিপাসার মতন। কেউ কিছুর লোভ করলে জন্তু-জানোয়ারের মত লুটে বা চুরি করে পেতে চায়। সেটা কখনোই গোপন থাকে না। আরেক ধরণের লোভ থাকে মনের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায়। চাতক পাখি দেখেছেন?'

'দেখেছি।

শুনেছি, চাতক পাখির পিপাসা পেলে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে শুয়ে থাকে। বৃষ্টির ফোঁটা মুখে পড়লেই তবে সে তিয়াস মেটায়। হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখিদের মত সে বৃষ্টির পানি পান করে না। হয়ত দেখা গেল যে, বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কোনো একটাও বৃষ্টির ফোঁটা তার মুখে পড়ল না। তার পিপাসাও মিটবে না। আমার লোভটা হচ্ছে সে রকম।'

নিনি বলল, 'শিঁকে ছিঁড়লে, থাকলে খেলাম। আর না থাকলে খেলাম না। এই তো? কিন্তু পুরোটাই নিয়তি নির্ভর!'

'হ্যাঁ। নিয়তিটাই সত্যি।' চুলোয় পানি ফুঁটছে দেখে মিজান বলল, 'পানি গরম হয়ে গেছে।'

গরম পানিতে চা-পাতা দিয়ে নিনি বলল, 'আপনাকে প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছি।'

'কি পেরেছেন?'

'আপনি চার-পেয়ে জীবের মত কেড়ে মেরে নেবার লোক নন। কিন্তু এখনকার যুগে কি এমনটা পাবেন? কে আপনাকে মুখে তুলে দেবে? সেই লোক কি এ দেশে আছে?'

'আছে।'

'সত্যি বলছেন?'

'বলছি।'

'কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু পারছি না।'

'দেখেন, আমি টিউশানি করতাম। টনিকে পড়াবার দায়িত্বটা আপনার আপা একরকম জোর করেই আমাকে দিয়েছিলেন। সবগুলোই আমার উপর চেপেছে। দিন চলছিল। টুসি আর বুলবুলির কি এমন ঠেকা বা দায় পড়ল যে, প্রায় জোর করেই আমাকে ওদের ফার্মের পার্টনার বানাল? কাজ করতে থাকলাম। অঞ্জলি কোনোদিন ভাবেনি তার গানের ক্যাসেট বেরোবে। তাও আবার দেশের প্রথম সারির একজন শিল্পীর সাথে। কিন্তু সুযোগটা ওকে ওরাই দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে সেধেই। তা ছাড়া...।'

কথা শেষ না করে চুপ হয়ে গেল মিজান।

'তাছাড়া কি?'

মিজানকে পাল্টা প্রশ্নে বিদ্ধ করে নিনি।

'তা ছাড়া আপনি আমাকে নিজেই কিচেনে নিয়ে এলেন। এক রকম সেধে। আপনি ইচ্ছে করে আমাকে সুযোগটা দিলেন আরো ঘনিষ্ট হবার। প্রায় মুখে তুলে দেবার মতই। এই ফাঁকা বাড়িতে আমি যদি আপনার দিকে এক পা আগাই তো আপনি এগিয়ে আসবেন দশ পা। কিন্তু আপনি নিজেই খুব ভাল করে জানেন যে, আমার সেই এক পা আগাবারও সাহসটা নেই। কিছুর জন্যে পুরো ভূমিকাটা আপনাকেই নিতে হবে। কিন্তু আপনার মনের ভেতর থেকে আজ কোনো উৎসাহ পাচ্ছেন না।'

মিজানের কথায় নিনির দুগালে লালচে ছোপ ফুটে উঠে। কেমন লাজ-নম্র কণ্ঠে বলে, 'আপনি এত খোলাখুলি কথা বলেন কেন? একটু গুছিয়ে অনেকগুলো শব্দের বুনটের ফাঁকে ফাঁকে বলবেন। তাহলে সেটা শুনতে খারাপ লাগবে না। মেয়েরা কি এমন সরাসরি কথা শুনতে অভ্যস্ত?'

চা হয়ে গিয়েছিল। চুলো নিভিয়ে দিয়ে কাপে চা ঢেলে দুধ-চিনি মিশিয়ে মিজানের দিকে একটা কাপ বাড়িয়ে ধরল নিনি। তারপর নিজের জন্যে এককাপ নিয়ে বলল, 'ছেলেরা সাধারণত রাখ-ঢাক করেই কথাগুলো বলে।'

'আমি তাদের দলে পড়ি না।'

'আপনি কি সমাজের দশজনের সাথে চলবেন না?'

'চলব। চলছি। তবে একাদশ লোকটি হয়ে।'

এক চুমুক চা গিলে নিনি বলল, 'আপনি একই সাথে খুবই চমৎকার আর বিরক্তিকর মানুষ!'

'সেটা বুঝতে পারি বলেই এগার নাম্বারে পড়ি। অন্যরা একই সাথে এমন দুটো বিষেশণে বিষেশায়িত হতে পারে না।'

ওরা দুজনেই নিরবে চা পান করে।

নিনি কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'বিকেল পর্যন্ত এখানেই থাকছেন। দুপুরেও এখানেই খাব।'

'তারচে আগেই বেরিয়ে গেলে হত না? বাইরে ঘোরাঘুরি করে উৎসবে চলে যাব।'

নিনি কিছুক্ষণ মিজানের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক।

নিনির সেই চাহনি লক্ষ্য করে মিজান চা খাওয়া বন্ধ করে কাপটা পাশে নামিয়ে রেখে লাফ দেবার ভঙ্গিতে মেঝেতে দাঁড়াল। আর তখনই নিনি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হোয়াই আর য়্যু টু মাচ জ্যান্টল? হোয়াই নট আ বিট নটি?'

তারপর জামার কলার ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলতে লাগল, 'হোয়াই? হোয়াই?'

মিজান হেসে বলল, 'আপনিও তো খুব ভাল মেয়ে!'

'ভাল মেয়ে না কচু!'

মিজান হাসতে লাগল।

'আমি যে আর পারি না! কষ্টে কষ্টে শেষ হয়ে যাচ্ছি!'

নিনি মিজানের কলার ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে।

এই কষ্টটা মিজান নিজকে দিয়েই বুঝতে পারে। অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তটাকে স্বর্গীয় করে তুলতে পারত। কিন্তু এখানেই যে মিজানের সব চেয়ে বড় আপত্তি!

ঘৃণা! ঘৃণা! ব্যাপারটায় বড় বেশি ঘৃণা! মানুষ কেন জন্তু-জানোয়ারের মত নিজকে ছোটো করবে এভাবে? মানব দেহ হচ্ছে এক একটা শিল্প। দেহের প্রয়োজনে দেহ সক্রিয় হবে শৈল্পিক ভাবে। বিবেক বোধ রুচিবোধ চিন্তা-ভাবনার বিচার-বিশে-ষণের অধিকারী হয়ে মানুষ কেন কামার্ত জানোয়ার হয়ে উঠবে? রিরংসা-কাতর একটা কুকুর বা কুকুরী কামস্পৃহা নিবৃত্তির জন্যে

তাড়িত হয়ে একটা আরেকটার কাছে আসে। প্রয়োজন মিটলে যে যার পথে চলে যায়। মানুষ কিছুতেই এমনটা করতে পারে না। কক্ষনো না! নিনিও তো এমনি একটা কাম-জর্জরিত কুকুরীর মতন। এর ডাকে কী করে সাড়া দেবে মিজান? আর কুকুরের ব্যাপারটা মনে হলেই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে আসে। নিজকে এক চুলও নাড়াতে পারে না। সেই ক্ষণে কামার্ত নারী তাকে নপুংসক ছাড়া আর কিইবা বলতে পারে? আর পারে তার মুখাবয়বে একরাশ থুথু ছিটিয়ে দিতে।

কিন্তু কখনো কখনো তার কি হয়ে যায় সে ও বলতে পারে না। বিচার-বিবেচনা, বিবেক-রুচিবোধ সব কিছুই যখন কাঁধ থেকে নেমে যায়। ওগুলো মুখ ফিরিয়ে দুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সেও ঠিক একই ভাবে উন্মাদ কুকুরগুলোর সারিতে এসে দাঁড়ায়। তার মানবস্বত্তা সে সময় বিলীন হয়ে যায়। ভুলে যায় নিজের অস্তিত্ব। কিন্তু পরে যখন ব্যাপারটার কথা মনে হয় তখন নিজকে বড়ই ঘিনঘিনে মনে হয়। মনে হয় তার পুরো শরীরটাই কার্তিক বা অগ্রহায়ণের একটা মাদি-কুকুরের বিকৃত যৌনাঙ্গ। এটা প্রতিবারই ঘটনার পর দু'এক দিন মনের ভেতর কিলবিল করে বেড়ায়। আর সে নিজের ভেতরই কেমন অপরাধীর মত হয়ে থাকে সারাক্ষণ। কোনো ভাবেই স্বস্তি পায় না।

এত কিছু ভেবে মিজানের শরীর শক্ত হয়ে আসে। নিনিকে কোনোরকম সান্ত্বনা দেয় না। সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছেও হয় না। তবে কিছুক্ষণ কাঁদবার সময় দেয়।

নিনি এক সময় কান্না থামিয়ে মুখ তোলে।

আর সে মুখের দিকে তাকাতেই মিজানের বুকটা কেমন হুঁ-হুঁ করে উঠে।

কান্না ভেজা চোখের নিনিকে পৃথিবীর সবচে দুঃখি মেয়ে বলে মনে হয়। সে নিনির মুখটা ধরে আঙুলের আলতো পরশে চোখের পানি মুছে দেয়। তারপর কী যে হয় বুঝতে পারে না। তার অন্তর্গত সমস্ত প্রতিরোধ সহসাই যেন ভেঙে পড়ে খানখান হয়ে। নিনির ঠোঁটের উপর চেপে ধরে নিজের ঠোঁট।

এভাবে অনেকক্ষণ। বারবার। ফলে তার মানব স্বত্তা বিলীন হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে।

ভার মুক্ত নিনি অল্পক্ষণের ভেতর কিচেনের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ল। মিজানের শরীরে যথারীতি ঘিনঘিনে ভাবটা চলে আসে। সে নিনিকে ঠেলে

জাগিয়ে বলে, 'উঠুন তো! বিছানায় গিয়ে ঘুমান। এখানে মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়ছেন কেন?'

নিনি জড়ানো স্বরে বলল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে! উঠবার শক্তি পাচ্ছি না!'

'উঠুন! আমি আপনাকে ধরছি।'

মিজান নিনির কাঁধ ধরে তুলে দাঁড় করায়।

তারপর জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে খাটের একপ্রান্তে বসিয়ে দেয়। আর নিনি তখনই আবার কাত হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। বুঝি ঘুমিয়েও পড়ে।

মিজান তার ঘৃণিত শরীরটাকে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। শাওয়ার ছেড়ে অনেক্ষণ ভেজে। নিজের শরীরটাকে মনে হয় নর্দমায় ডুবে থাকা কোনো পঁচা বস্তু। অথবা মর্দা কুকুরের পঁচা-গলা শিশ্ন।

গোসল সেরে সে দিগম্বর হয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। নিনি এখন মড়ার ঘুম ঘুমাচ্ছে। খালি বাড়িতে কেউ তাকে এমন অদ্ভুত অবস্থায় দেখতে আসছে না। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে তিন্নির বেডরুমে ঢোকে। তারপর ওয়ার্ডরোব খুলে টনির বাবার প্যান্ট-সার্ট বের করে। টনির বাবা শরীর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে মিজানের চেয়ে বেশি। তাই সেগুলো তার গায়ে বেশ ঢিলে ঢালা ভাবে ফিট হল। কোমরের কাছে কিছুটা ঢিলে থাকবার কারণে প্যান্টটা একটু নিচের দিকে নেমে থাকল। সার্টটা ইন করেও কোনো হেরফের হল না। এতে অবশ্য একটা সুবিধা হল এই যে, অন্তর্বাস ছাড়া প্যান্ট পরে যে অসুবিধাটা হচ্ছিল, সেটা আর রইল না।

সে ভাবল বাথরুমে তার পরিত্যাক্ত প্যান্ট-সার্ট আর অন্তর্বাসটা রয়েছে। সেগুলো এখন কি করবে? অবশ্য প্যাকেট করে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু নোংরা কাপড় নিয়েই বা সে করবে কি? তার চেয়ে ভাল প্যাকেট করে ডাস্টবিনেই ফেলে দেবে। তবে আগেকার মত আজ খুব বেশি মনোবৈকল্যে সে ভুগছে না। বরঞ্চ কিছুটা বেশি প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে শরীরে ও মনে। সে ভাবে, এটা কি দীর্ঘ কালীন বিরতির ফল? নাকি মৌরীর কারণেই এমনটা হত? নিনি অবশ্য মৌরীর চেয়ে বেশ খানিকটা ভিন্ন টাইপের মানুষ। বিশেষ করে চিন্তায় আর মননে।

মিজান ড্রয়িং রুমে বসে একটা বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায়। কিছু পড়ে না। পাতা উল্টিয়ে শুধু ছবি দেখে। আর অপেক্ষা করে নিনির ঘুম ভাঙবার। কিন্তু এক ঘন্টা পেরিয়ে যায়। নিনির ঘুম ভাঙে না। তার মনে

সন্দেহ হয় যে, নিনি সত্যিই ঘুমাচ্ছে তো?

সে গিয়ে দেখে, নিনি হাস্যকর ভঙ্গিতে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ভঙ্গিটাকে ব্যাঙের সাথেই তুলনা করা চলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে খুব ধীর লয়ে ভারি বুক উঠানামা করছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে মৌরীর সাথে নিনির তুলনা খোঁজে। নাহ্ মেলে না। কিছুই মেলে না। নিনি নিনিই। আর মৌরী মৌরীই।

সে ফিরে এসে তার সমান উঁচু ফ্রিজের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়িটা নিঝুম। কোথাও কোনো অতিরিক্ত শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর নিঝুম বলেই ফ্রিজের খুব অল্প শব্দটাও এখন সে শুনতে পাচ্ছে। সাধারণত ফ্রিজের যান্ত্রিক শব্দটা কানে আসার কথা না।

হাতল ধরে টান দিতেই ফ্রিজের দরজা খুলে যায়। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল নানা পদের বাটি, বাক্স আর ছোট বড় বোতল। কারো বাড়ির ফ্রিজে কি কি থাকতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। দোকানের ফ্রিজ আর বাড়ির ফ্রিজের ভেতরকার গঠনও ভিন্ন।

সে বাটি আর বাক্সগুলো খুলে খুলে দেখে। খাওয়ার মত তেমন কিছু নেই। সে হতাশ হচ্ছিল আর বাটির ঢাকনা খুলছিল। নিচের থাকে একটা ডিশ দেখে সেটার ঢাকনা খুলতেই ভাত দেখতে পায়। আরেকটা খুলে তরকারিও পেয়ে যায়। মুরগির গোস্ত। গত কাল কিংবা আরো আগের ভাত-তরকারি। একবার তার মনে হল পরের বাড়িতে এসে পে-ট বাটি খুলে খাবার খোঁজা কোনো ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না। অবশ্য কোনো সত্যিকারের ভদ্রলোক পরের বউয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টিও করে না। আমি তো আসলে একটা লোচ্চা! লম্পট শ্রেনীর মানুষ!

নিজের শ্রেণীটাকে আবিষ্কার করতে পেরে খুশি মনে সে ভাত তরকারির ডিশ নিয়ে কিচেনে ঢোকে। খাওয়ার আগে গরম করে নিতে হবে। ফ্রিজে ছিল বলে নষ্ট বা গন্ধ হয়ে যায়নি। এক সময় তার মনে হল এত ঝুট ঝামেলা না করে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারত। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে ঘরে খাওয়া আর বাইরে খাওয়ার টেস্টও ভিন্ন। তার এই স্বেচ্ছায় খাবার গরম করবার ঝামেলা কাঁধে তুলে নেবার অর্থ হচ্ছে মানুষ নামের গৃহপালিত জীবটির গৃহপ্রীতি।

গরম খাবার নিয়ে মিজান ডাইনিং রুমে এসে টেবিলে খাবার নামিয়ে রেখে খাওয়ার প্রস্তুতি নেবার সময় নিনি এসে হাজির হল। মাথায় তোয়ালে বাঁধা। পরনে শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ।

নিনি পাশে দাঁড়িয়ে মিজানের সামনে রাখা পে-টে ডিশ থেকে ভাত তুলে দেয়। দৃশ্যটা খুব ভাল লাগে মিজানের। নিনিকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে তা না করে বলল, 'আপনি কখন জাগলেন আবার গোসলও সেরে ফেললেন?'

নিনি তরকারির ডিশ হাতে নিয়ে বলল, 'আপনি যখন বেড়ালের মত খাবার খুঁজছিলেন।'

মিজান বলল, 'বেড়াল তো আপনি। বেড়াল হাঁটবার সময় কোনো শব্দ পাওয়া যায় না।'

নিনি আরেকটা পে-ট নিয়ে মিজানের পাশেই চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

খেতে খেতে মিজানের মনে হয় আজ সব কিছুই খুব ভাল আর খুশির। নিনির সাথে অমন একটা বিশ্রি ব্যাপার হয়ে যাবার পর এখন কোনো খারাপ লাগছে না বা নিজকে ঘৃণিত মনে হচ্ছে না। খেতেও লাগছে বেশ। জিভে যেন নতুন করে স্বাদ ফিরে এসেছে। সব কিছুই মনে হচ্ছে নতুন করে আবিষ্কারের মত।

নিনি বলল, 'বিকেলে না গেলেই কি নয়?'

মিজান চমকে উঠে বলে, 'মানে?'

'বলছিলাম, আজকের প্রোগ্রামটা এ্যাভয়েড করা যায় না?'

'পাগল নাকি? ওরা দুজন আমার ওপর ক্ষেপে যাবে। তাছাড়া আমাদের ব্যবসার দিকটাও দেখতে হবে!'

'সরি! আমি অবশ্য সে দিক দিয়ে ভাবিনি।'

'আপনি কি যেতে চাচ্ছেন না?'

'তা না। আসলে আপনাকে কাছ ছাড়া করতে আমার ভাল লাগবে না।'

মিজানেরও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না। অনেকদিন পর আজ কেন জানি তার নিজকে খুবই সুখি বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটু একটু করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে সে।

এই প্রাণ ফিরে পাওয়াটা মানে কি? কি সেই প্রাণ-শক্তিটা? তাহলে কি প্রাণ-শক্তিটা নিনি? নিনির কাছে কি মৌরীর স্মৃতি এভাবে ম-াণ হয়ে যাবে?

সাত

রাশিয়ান কালচারাল হল লোকে লোকারণ্য। এ ধরণের অনুষ্ঠানে তেমন মানুষ আসে না। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। শিল্পী আর প্রকাশনার সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তাদের কাছের মানুষগুলোই ভদ্রতা করে আসে। মান বাঁচাতে আসে। লিখিত বা মৌখিক ভাবে অনুনয় করে যাদের আমন্ত্রণ করা হয়।

মিজান টুসির প্রশংসা করে মনেমনে। সেই সাথে ঝানু ব্যবসায়ি হিসেবেও মেনে নেয়। তবে আজ এত মানুষ আসবার পেছনে কাজ করেছে ব্যাপক প্রচারণা। আর এই প্রচার নিয়েই মিজান আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু টুসি মিজানের কথায় পাত্তা দেয়নি। সে বুঝতে পারছে যে, টুসি তার কথায় পাত্তা দিলে আজ কেবল তারা নিজেরা নিজেরাই এত বড় হলঘরটাতে বসে থাকত।

নিনিকে পাশে নিয়ে মিজান যখন সামনের সারির দিকে এগিয়ে গেল মঞ্চের উপর আমন্ত্রিত অতিথিদের পাশে বসা অঞ্জলি আর বুলি কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। মিজান সেদিকে একবার তাকালেও তাদের দৃষ্টির ভাষা পড়তে পারল না। নিনিকে বসিয়ে দিয়ে মঞ্চে গিয়ে একমাত্র খালি চেয়ারটাতে বসতেই ঘোষিকার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'উপস্থিত সুধী, আজকের অনুষ্ঠান এক্ষুনি শুরু হতে যাচ্ছে। আজকের সভাপতি আমাদের তথা এ দেশের গৌরব...' আরো কি কি যেন বলল। মিজান কিছুই বুঝতে পারল না। তার জানা নেই এসব অনুষ্ঠান কেমন হয়। তার মন পড়ে আছে দর্শকদের আসনে একাকী বসে থাকা সৃষ্টির দিকে। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে যে, আজকের পর থেকে তার মা অঞ্জলি নামের শিল্পী হয়ে দিন দিন দুরে সরে যাবে?

সভাপতি কি কি বলে তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে মঞ্চ থেকে নিচে গিয়ে সামনের সারির খালি আসনগুলোর একটিতে বসে পড়লেন। টুসি সহ একেএকে সবাই নেমে গেল। মিজান গিয়ে নিনির পাশে বসে সৃষ্টির দিকে আবার তাকাল। টুসি খানিকটা দুরেই বসেছে। মিজান ভাবল, টুসি কি রাগ করেছে? কিন্তু কেন করবে? তেমন কোনো কারণ তো তার জানা নেই।

সৃষ্টি হয়ত অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ পেতেই দৌঁড়ে মিজানের কাছে চলে আসে।

তাকে ধরে নিজের কোলে বসিয়ে দিতেই নিনি কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বাচ্চাটা কে?'

'অঞ্জলির মেয়ে।'

'ভেরি সুইট!' বলে, সৃষ্টির গাল টিপে দেয় নিনি।

তারপর সৃষ্টিকে বলল, 'কি নাম তোমার? এস। আন্টির কোলে।'

সৃষ্টিরও হয়ত নিনিকে ভাল লেগে গেছে। মিজানের কোল থেকে নেমে নিনির কোলে গিয়ে বসে। আর তখনই মঞ্চে মিউজিক শুরু হয়। লাইটগুলো নিভতে থাকে একটা একটা করে। শুধু মঞ্চের উজ্জ্বল লাইট গুলোই বিভিন্ন রঙ নিয়ে জ্বলতে নিভতে থাকল।

ঘোষিকা কোনো আড়াল থেকে আবার ঘোষনা করল, 'এবার আপনাদের দ্বৈত কণ্ঠে গান শোনাবেন দেশ বরেণ্য শিল্পী বুলি ওয়াহিদা ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী অঞ্জলি।

তুমুল করতালির ভেতর দিয়ে গান শুরু হল। হলে আর কোনো শব্দ নেই। কোনো শ্রোতা উসখুস বা ফিসফাস করছে না। মিজানের মনে হল, বুলির চাইতে অঞ্জলির কণ্ঠস্বর একটু বেশি সুরেলা আর মিষ্টি যেন। ডুয়েট বলে পার্থক্যটা বেশি করে ধরা পড়ছে। তবে দুজনের গানই সুন্দর হচ্ছে! এতে সন্দেহ নেই।

গানের ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টি নিনির সাথে টুকটাক আলাপ করছিল। দুএকটা শব্দ কানে আসতেই মিজান বুঝতে পারে যে, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। গান শেষ হলেও মনে হয় আরো যেন বাকি থেকে গেল। উপস্থিত নারী-পুরুষ সমস্বরে চেঁচাতে লাগল আরো গাইবার অনুরোধ নিয়ে।

ঘোষিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা, আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। প্রকাশিত গানের পালাও শেষ হয়েছে। আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনাদের আজকের দাবী ভবিষ্যতের কোনো এক অনুষ্ঠানে পূরণ করা হবে।'

তুমুল প্রতিবাদ উঠল। "না। না। বুলি অঞ্জলি একা একা গাইতে হবে।"

তারপরই আসনের পেছনে হাত দিয়ে শব্দ করতে লাগল সবাই। এমন সময় সভাপতি মঞ্চে উঠলেন। বললেন, 'আমরা আপনাদের অনুরোধ বা দাবী যেটাই বলেন, আমরা সেটার অসম্মান করব না। কারণ শ্রোতারাই আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ। তবে আমাদের এই দুই শিল্পী একটা করে গান আপনাদের শোনাবেন। তার পরও অনুরোধ আপনারা আর আবদার করবেন না।'

আবার তালি বেজে উঠল।

প্রথমে গাইল বুলি। তার বর্তমান হিট গানটি। তুমি যে আমার হৃদয় ছাঁয়ায় / অবহেলায় বেড়ে ওঠা / বুকের ভেতর দুর্বা-শ্যামল / প্রেমের বেতস-লতা।

হল ভর্তি মানুষ দুলে উঠল সুরের মুর্ছনায়।

অঞ্জলি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলল, 'আজকের উপস্থিত সুধী, আমার অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী এবং বাংলাদেশের অনেকেরই প্রিয় তিনি। সেই বিদগ্ধ শিল্পী আবদুল জব্বারের একটি গান আমার খুবই প্রিয়, যা কেবল আমিই শুধু নই, হয়ত আপনারাও কোনো নারীকণ্ঠে শোনেন নি। তেমনই একটি গান শ্রদ্ধেয় আব্দুল জব্বার এবং আপনাদের সম্মানে গাইতে চেষ্টা করব। আর সেটা হচ্ছে তারা ভরা রাতে।'

অঞ্জলির কথা শেষ হবার সাথে সাথেই করতালিতে হলঘরটা ফেটে পড়বার উপক্রম হল যেন। যন্ত্রিরা সুর ছড়িয়ে দিল সেই ফাঁকে।

গান শুরু হতেই যেন বেদনার অন্তহীন অতলে তলিয়ে যায় সমস্ত মানুষ। যেন ওরা বুঁদ হয়ে গেছে মায়াবী সুরের ইন্দ্রজালে। অঞ্জলির গাওয়ার ধরণে গানের কথাগুলো যেন মরমের মর্মমুলে গিয়ে ঘা মারছে। অন্যদের কারো কথা বলতে পারবে না মিজান। কিন্তু তার চোখ দিয়ে সত্যি সত্যিই পানি এসে গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে, গানের বাণীর সাথে শিল্পীর একাত্ম হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আজ সেটিই বুঝি আবার প্রমাণ করে দিয়েছে অঞ্জলি। আজকের উপস্থিত শ্রোতারাই কেবল অনুভব করতে পারবে এর সত্যতা।

গান শেষ হলে কিছুক্ষণ কোনো শব্দ শোনা যায় না। কখনোই অঞ্জলির সুরের রেশ যেন কাটবে না। যেন সবাই ভুলে গেছে যে, হাত তালি দিয়ে শিল্পীকে সম্মানিত করতে হয়। প্রথমে চট করে ছোট্ট কোনো হাতের তালি বেজে উঠল। মিজান দেখল সৃষ্টির হাত নড়ছে। আর সাথে সাথেই দর্শকদের করতালিতে সৃষ্টির সেই হাততালি চাপা পড়ে গেল।

লাইটগুলো একেএকে জ্বলে উঠতে থাকে।

মিজান ছুটে গেল স্টেজে। দেখল বুলি অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু অঞ্জলি তার মুখ ফিরিয়ে রেখেছে দেয়ালের দিকে। বুলি বলছিল, 'ছি ছি! এমন করতে আছে নাকি? তুমি আমার চাইতেও অনেক ভাল করেছ!'

অঞ্জলি চোখ মুছে বলল, 'অডিয়েন্সের রেসপন্স না পেয়ে আমি সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে এ্যাভয়েড করেছে ভেবে দুঃখে আর লজ্জায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল!'

মিজান বলল, 'আজ যে গান শোনালে, তা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান!'

অঞ্জলি বলল, 'আমার মেয়ে কোথায়?'

মিজান হাত তুলে দেখাল, নিনির কোলে চড়ে তাদের দিকেই আসছে সৃষ্টি।

দুজন ভদ্রলোক স্টেজে উঠে এল। তাদের একজন মিজানকে বলল, 'এক্সকিউজ মি! এখানের যারা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে, তাদের কারো সাথে কথা বলতে পারি?'

'শিওর! আমি মিজান। আরো দুজন আছেন আমার সাথে।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি আতা খান। ফিল্ম ডিরেক্টর। আর আমার সাথে ও সুজিত কামাল। মিউজিক ডিরেক্টর।'

মিজান দুজনের সাথে হাত মিলিয়ে পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে বলল, 'আমাদের অফিস ইস্কাটনে। আসবেন।'

আতা খান বলল, 'অঞ্জলি কি পে- ব্যাকে ইন্টারেস্টেড?'

মিজান হেসে বলল, 'আমার তো মনে হয় সব আর্টিস্টেরই ইন্টারেস্ট থাকবার কথা!'

এরই মাঝে টুসি মিজানকে কিছু বলতে এসে আতা খানকে দেখে বলল, 'আরে আতা ভাই আপনি এখানে?'

আতা খান হেসে বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

'আমি না হলে চলে? আজকের প্রোগ্রাম তো আমরাই অর্গানাইজ করেছি! সপ্তাহ খানেক ধরে আপনাকে কত্ত খুঁজেছি!'

আতা খান বললেন, 'দেশে ছিলাম না। বাই দ্য ওয়ে, আমার নেক্সট ফিল্মে অঞ্জলিকে দিয়ে গান করাতে চাই।'

'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'খুশি হলাম। খুব শিঘ্রিই তোমার সাথে কথা বলব।'

'ওকে!'

আতা খান তার সঙ্গীকে নিয়ে চলে যেতেই টুসি মিজানকে বলল, 'ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।'

'তোরা চলে যা। আমার সাথে নিনি আছে।'

'কোথায়?'

পাশে দাঁড়ানো নিনিকে দেখিয়ে দিল মিজান।

'হাই!' বলে, টুসি হাত বাড়িয়ে দিল নিনির দিকে।

নিনি টুসির হাত ধরে বলল, 'হাই।'

কিন্তু টুসি নিনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আপনি দেশের বাইরে থাকতেন? মনে হয় অনেকবার দেখেছি।'

নিনি বলল, 'আমারও তো একই প্রশ্ন।'

মিজান বলল, ইটালি। মিলান।'

এ কথা শুনে দুজনেই চমকে তাকায় মিজানের দিকে। আর সাথে সাথেই হেসে ফেলে। বলে, 'ঠিক তাই!'

নিনির হাত ছেড়ে দিয়ে টুসি বলল, 'আমি বুলিকে শান্তিনগর নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি না যাও তাহলে অঞ্জলিকে কি করে পৌঁছে দেই?'

'তা নিয়ে ভাববেন না।' নিনি বলল। 'একটা ক্যাব নিয়ে আমরা সাথে যাব।'

গ্রীণরুমে প্রতীক্ষারত অঞ্জলিকে ডেকে টুসি বলল, 'মিজান থাকল। আমরা চলি। নেস্ট উইকে দেখা হবে।'

তারপর হঠাৎ অঞ্জলিকে একটু আদর করে টুসি বলল, 'রিয়েল আর্টিস্ট! লাস্ট গানটায় তোমার সাথে আমার নতুন করে পরিচয় হল। চলি।'

বাইরে বেরিয়ে নিনি বলল, 'এখন বাড়ি গিয়ে তো অঞ্জলি আপার রান্না-বান্নার ঝামেলা সইবে না। আমরা একসঙ্গে কোথাও খেয়ে নিতে পারি। রাত এখন আটটা প্রায়।'

অঞ্জলি বলল, 'আমার আজ খুশির দিন। একটুও ঝামেলা মনে হবে না। আজ রাতটা আমার বাড়িতে খাওয়ার জন্যে আপনারা গেস্ট হয়ে চলেন।'

'আমাদের ফিরতে ফিরতে বেশি রাত হয়ে যাবে না?'

'ঢাকা শহরে কখন রাত নামে ঠিক জানেন?'

'তা জানি। কিন্তু আমার বাড়ি খালি যে!'

তবুও বেশিক্ষণ দেরি করাব না। কথা দিচ্ছি বারোটার আগেই ছেড়ে দেব।'

ট্যাক্সির জন্যে রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে অঞ্জলি বলল, 'আজকে গান নিয়ে কিন্তু কিছুই বলনি মিজান!'

মিজান মুখ ব্যাজার করে বলল, 'ভাল না! বিশেষ করে শেষের গানটা। অন্যের গাওয়া গান নকল করে গাইতে গিয়ে এত বাজে হয়েছে যে, আমার কান্না পেয়ে গেছিল।'

সৃষ্টি বলে উঠল, 'চাচু, তুমি তো কাঁদছিলেই! আন্টি আর আমি তোমার চোখে পানি দেখেছি।'

অঞ্জলি কোনো কথা বলল না।

মিজান বলল, 'লাইট কম বলে অমন দেখা গেছে। আমি কি বাচ্চা

ছেলে যে কাঁদব?'

সৃষ্টি যেন কথাটা মেনে নিল। কিছু বলল না। তারপরই একটু দূরে একটা ইয়েলো ক্যাব দেখে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'চাচু, ওই যে একটা ট্যাক্সি!'

তারা ট্যাক্সিটার দিকে এগিয়ে যায়।

পরদিন প্রায় সব পত্রিকাতেই অঞ্জলির শেষ গানটা আলোচনায় এসেছে। টুসি মিজানকে ফোনে জানাল বাজারের অবস্থা। এমন চলতে থাকলে ক্যাসেট আর সিডি ফুরিয়ে যেতে তিন দিন লাগবে না।

'তাহলে আরো কপি করতে অর্ডার করে দে!'

'না।'

টুসি মিজানের কথায় পাত্তা দেয় না। বলে, 'নতুন কোনো কপি হবে না।'

'তাহলে নকল ক্যাসেটে বাজার ভরে যাবে!'

'যাক। তার আগে আমাদের টার্গেট ফুল হয়ে যাবে। তবে মনে রেখ, পাইরেসি এক ধরণের বিনা পয়সার পাবলিসিটি!'

'তোদের যেমন ইচ্ছে!'

'অফিসে আসছ কখন?'

'আজ আমার ছুটি। নিনির জ্বরটা আবার উঠেছে। ওর পেছনেই আমার আজ ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে। বিকেলের দিকে একবার রিং দেব।'

'আচ্ছা।' বলে, ফোন রাখে মিজান।

নিনি মিজানকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই মিথ্যে বললেন কেন?'

'মিথ্যে একটুও বলিনি। আপনার মনে জ্বর আছে বলেই আজ ঠিক করলাম আপনাকে সঙ্গ দেব!'

নিনি রাগ দেখিয়ে বলল, 'এ জন্যে মিথ্যে বলতে হবে নাকি?'

'মিথ্যে না বললে টুসি আজ আমাকে খাটিয়ে মারত। কোনো ডিরেক্টর ফিরেক্টর এলে আমাকেই সামলাতে হয়। ব্যাটারা খুবই ঘ্যানঘ্যানে টাইপের। নিজের গীত শোনাতেই ব্যস্ত থাকে। আমার অসহ্য লাগে! তা ছাড়া আজ অনেক লোকজন আসা যাওয়া করবে। টুসির ফার্মের নাম পত্রিকায় এসেছে। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে তার ডিমান্ড বাড়বে।'

'এমন হলে ব্যবসা করবেন কিভাবে?'

'ব্যবসা আমি করছি নাকি? আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।'

নিনি ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনের দিকে যায়। এমন সময় টিএন্ডটির ফোনটা বেজে উঠলো।

মিজান নিনিকে ডাকে ফোন ধরবার জন্যে।

নিনি ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো।'

ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর পেয়ে বলল,' আপা তুমি? কি ব্যাপার? ভাল আছ? টনি কেমন আছে? কি বলছ? আজকে আসতে? কিন্তু একাএকা কি পারব? ঠিক আছে। দেখি।' বলে, নিনি ফোন রেখে মিজানকে বলল, 'আপা বলছে তার ওখানে যেতে।'

'তো যান!'

'শুনলেনই তো, আমি যে বললাম, একাএকা যেতে পারব না! আপা বলেছে আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'আমাকে পাবেন কোথায়?'

'আপনার ঠিকানায় গিয়ে খুঁজে বার করতে বলেছে।'

মিজান বলল, 'আমার যে আজ কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করছে না!'

'আমার সাথে থাকতে ইচ্ছে করছিল না? চলেন। মুন্সিগঞ্জ থেকে ঘুরে আসি। আমার কাছেকাছে থাকাও হল আবার ঘুরে বেড়ানোও হল।'

'যাবেন কিভাবে?'

নিনি চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

মিজান বলল, 'আমি ট্রান্সপোর্টের কথা বলছি। বাসে চড়ে, না ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন?'

নিনি বলল, 'মুড়ির টিনে চড়ে। অনেক ভিড় হল-া-চিল-া হয়। সব স্টেশনে থেমে যাত্রী উঠাবে নামাবে। এক সময় মুন্সিগঞ্জ গিয়ে থামবে।'

'অসম্ভব! এভাবে আমি যেতে পারব না! দম বন্ধ হয়েই মারা যাব! যে ভয়ে আমি বাসে চড়তে চাই না, আপনি সেটাই করতে চাইছেন?'

'একটা এক্সট্রা এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যাবে।'

'না।' মিজান জোর আপত্তি জানায়। 'ট্যাক্সি না হলে আমি যাবই না।'

'আচ্ছা তাই হবে। আমি শাড়ি পরব কিন্তু। আপনি দুলাভাইয়ের পাঞ্জাবি পরবেন।'

'পাঞ্জাবি আমার পরতে ভাল লাগে না!'

'আপনার কি ভাল লাগে শুনি?'

নিনি রেগে উঠল। 'আপনার এটা ভাল লাগে না, ওটা ইচ্ছে হয় না, সেটা অপছন্দ! কেমন মানুষ আপনি? আপনি কি জানেন অনেক সময় অন্যের ইচ্ছের সম্মানটা করতে হয়? যে কারণে কখনো কখনো নিজের অপছন্দের কাজও সম্ভব হলে করতে হয়?

মিজান অস্থির ভাবে বলল, 'আসলে আপনি বুঝতে পারছেন না!'

'বুঝতে ঠিকই পারছি। আপনি লোকটা খুবই বিরক্তিকর। একঘেয়ে। আর এ জন্যেই আপনার বউ পালিয়েছে বলে আমি মনে করি!'

মিজান কেমন বেদনাহতের মত তাকিয়ে থাকল নিনির মুখের দিকে।

নিনিরও বুঝি খারাপ লাগল। বলল, 'সরি! আমি আসলে কষ্ট দেবার জন্য কথাগুলো বলিনি। এক সাথে চলতে গেলে অনেক সময় সঙ্গের মানুষটির ইচ্ছেকে মেনে নিতে হয়। নিজকে কোনটা ভাল লাগবে, কি লাগবে না, সেটা সব সময় নিজে বোঝা যায় না। তা ছাড়া কখনো কখনো অন্যের চোখ দিয়েও নিজের সৌন্দর্য বিচার করতে হয়!'

তারপর নিনি মিজানের পাশে বসে বলল, 'গোলাপ বলল, জানি না আমি দেখতে কেমন। কিন্তু তুমি যখন বললে সুন্দর! আমি সুন্দর হলাম! কোনো একটা কবিতায় এমনই একটা কথা পড়েছিলাম।'

মিজানের মনটা আবার ভাল হয়ে গেল। বলল, 'কার কবিতা?'

'এত বছর পর কি এসব মনে থাকে?'

মিজান উঠে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার নেয়। শেভ করে। চুলে ক্রিম মাখিয়ে চিরুনি দিয়ে চুলগুলো পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর স্প্রে করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চুলগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে দেখল বিছনার উপর একটা অ্যাশ কালারের সিল্কের পাঞ্জাবি রাখা আছে। বুকের দিকে হালকা রঙের সুতোর কাজ করা। মিজানের খুব পছন্দ হল। সে মনেমনে স্বীকার করে নেয় যে, অনেক সময় অন্যের পছন্দের উপর নির্ভর করাটাও খারাপ না।

ট্যাক্সি জার্নিটা খারাপ হল না। মিজান শুনেছিল যে, সায়দাবাদের পর থেকেই প্রচন্ড ভিড়ের কারণে রাস্তায় গাড়ি আর চলতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যাম লেগেই থাকে। তবে আজ তেমন জ্যাম পাওয়া গেল না। বেশ নির্বিঘ্নেই রাস্তাটা পেরিয়ে আসতে পেরেছে।

নদী পেরিয়ে তিন্নির ওখানে যেতে হবে বলে ওরা ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে বিদেয় করে দেয়।

মিজান বলল, 'সারা দেশে এত এত ব্রিজ-সাঁকো তৈরি হচ্ছে,

আপনাদের এখানে এখনো খেয়া নৌকা চলে? দেশের এমপি চেয়ারম্যানরা করছে কি?'

'কিছু একটা তো করছেই। আপনি আমি আসি না বলে কিছু জানিও না। খবর কাগজে দেখেছি যে, আর বছর খানেকের মধ্যেই এখান দিয়ে একটা রাস্তা হবে।'

'তাহলে তো ভালই!'

খেয়াঘাটে পৌঁছুতেই বিভিন্ন নৌকা থেকে মাঝিরা তাদের ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করল নিজেদের নৌকায় উঠাবার জন্য।

মিজান দেখছিল বড়সড় নৌকা আছে কিনা। কিন্তু এরই মাঝে নিনি একটা বুড়ো মাঝির ছোট নৌকাতে গিয়ে উঠেছে। সেখান থেকে হাতছানি দিয়ে মিজানকে ডাকল।

নৌকার দিকে এগিয়ে যাবার সময় দেখল, নিনিকে ছাপার শাড়িতে চমৎকার দেখাচ্ছে। গ্রামের উচ্ছল কিশোরীর মত।

মিজান উঠে বসতেই মাঝি বৈঠা দিয়ে ঠেলে নৌকা পানিতে ভাসায়। নদীর পানিতে কোনো ঢেউ নেই। পুকুরের পানির মতই নিস্তরঙ্গ। পানিটাও তেমন স্বচ্ছ নয়। বাংলাদেশের নদীগুলো একদিন হয়ত সবগুলোই শুকিয়ে যাবে। দেশটা হয়ে যাবে মরুভূমি। এ দেশের সবগুলো নদীই ভারতের মাটি দিয়ে পথ করে এসেছে। যার ফলে ভারত ইচ্ছে মত নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ। অথচ নদী হচ্ছে প্রকৃতির দান। এতে মানুষের হস্তক্ষেপ প্রকৃতি কখনোই পছন্দ করে না। প্রতি বছরই ভারতের বিশাল একটা অংশ প-াবিত হয়। বাড়ে মানুষের কষ্ট। তখন সে দেশের বাঁধ খুলে দিলে অসময়ে প-াবিত হয় বাংলাদেশ।

নৌকা বাইতে কষ্ট হচ্ছে বুড়োর। প্রায় হাঁড় জিরজিরে শরীরটার খাঁচাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়। এসব দেখে নিনির বুঝি কষ্ট হয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'এত বয়স হল আপনার এখনো কেন কষ্ট করেন?'

বুড়ো একবার তাচ্ছিল্য নিয়ে নিনির দিকে তাকাল। মনে মনে হয়ত বলল খাজুইরা প্যাচাল ক্যান?

নিনি বুড়োর জবাব না পেয়ে বলল, 'আপনার ছেলে মেয়ে নেই?'

'আছে।'

'ছেলেরাও তো এ কাজ করতে পারে।'

'হ্যারাও করে। আলাদা সংসার। যা আয় করে তা দিয়া হ্যাগোই

চলে না।'

নিনি বুড়োর কথায় উৎসাহ পায় না। সে নদীর তীরবর্তি গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

মিজান নিনিকে দেখে। মনে মনে ভাবে, এই মেয়েকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে, এ সারাক্ষণ মনের ভেতর অনন্ত এক দুঃখের গ-াণি বয়ে বেড়াচ্ছে?

নৌকা তীরে ভিড়তেই নিনি ব্যাগ খুলে একটা বিশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল বুড়োর দিকে।

বুড়ো অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'আমার কাছে কোনো ট্যাহা-পইসা নাই। আফনেরাই পইলা পরথম!'

মিজান বলল, 'সবটাই রাখেন।'

বুড়োর মুখটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নৌকা থেকে নেমে তীরের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতেই রিকশাঅলারা ছেঁকে ধরে ওদের।

ইটে ছাওয়া রাস্তা। এবড়ো থেবড়ো। ঝাঁকুনিটা অসহ্য লাগে মিজানের। কিন্তু নিনিকে কিছু বলতেও পারছে না। মনে মনে নিজকেই গাল। ভাবে যে, তার ইচ্ছে যেমন হয়েছিল আজ সারাটা দিন নিনির সাথে থাকবে। বিধাতা তার সেই সাধ পূরণ করছেন। কিন্তু সেটা বড়ই নিষ্ঠুর!

এক সময় নিদারুণ যন্ত্রনাময় পথচলা শেষ হয়ে ছোট্ট সুন্দর একটা দোতলা দালানের সামনে রিকশাটা থামল।

রিকশা থেকে নেমে মিজান আরামের একটা শব্দ করে কোমর ঘুরিয়ে দেহের আড়মোড়া ভাঙে। নিনি ভাড়া মিটিয়ে নেমে গেটের কাছে হেঁটে যায়।

তারপর গেট ঠেলতেই সেটা খুলে যায়। নিনি গেট ধরে রেখে মিজানকে বললো, 'আসেন।'

চারদিক দেয়াল ঘেরা বাড়িটার ভেতর গাছ-গাছালির ছাঁয়া। ইট বাঁধানো সরু পথ। একটা পাকা-ঘাটলা দেয়া পুকুরও আছে। বাড়ির পরিবেশটা দেখতে কোনো সৌখিন মানুষের বাগান বাড়ির মতই মনে হয়। মিজানের সন্দেহ হয় যে, টনির বাবা কোনো একসময় এ বাড়িতে রক্ষিতা পুষতেন। খোঁজ নিলে সত্যটা বেরিয়েও আসতে পারে।

টনি মিজানকে দেখতে পেয়েই কেমন বাচ্চা ছেলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। মিজান অবাক হয়ে দেখে টনির এই উচ্ছ্বাস। টনি কি ভুলে গেছে যে, কিছুদিন আগেই ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে? আর কিছুদিন পর ওকে

কলেজে ভর্তি হতে হবে?

টনি এসে মিজানের একটা হাত ধরে বলল, 'আঙ্কেল ভাল আছেন? আপনি এসেছেন আমার খুব ভাল-াগছে! এখানের কাউকে চিনি না। কোনো জায়গাও চিনি না। সারাদিন ঘরেই থাকি। আমার খুব খারাপ লাগে!'

মিজান বলল, 'এই সুযোগে কলেজে ভর্তির প্রিপারেশানটাও নিয়ে নিতে পারতে কিন্তু!'

'গুড আইডিয়া! আমার একটুও মনে ছিল না!'

তারপরই কিছু মনে পড়ল যেন। আর সাথে সাথেই তার উচ্ছ্বাস থেমে গেল। বলল, 'আম্মু বলেছে আমাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে। পরশু মামার সাথে কথা হয়েছে!'

মিজান বলল, 'তাহলে তো আরো ভাল হয়। সেখানে পড়াশুনার কত সুযোগ!'

'কিন্তু আমাদের দেশটা ছাড়া অন্য দেশ আমার ভাল লাগবে না! আমাদের দেশে তো অনেক ভাল কলেজ আছে। পড়াশুনাও ভাল হয়!'

'হয় মানি। কিন্তু তুমি কি জানো সারা বিশ্বে কত হাজার ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারছে না কেবল সুযোগের অভাবে? আর আমাদের দেশটা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। তুমি পড়াশুনা শেষ করে ফিরে এলেই তো হল। তখন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলবে না।'

মিজানের কথাগুলো টনির পছন্দ হল। বলল, 'ঠিক বলেছেন! মাঝে মাঝে নিজকে আমার খুবই বোকা বলে মনে হয়!'

তারপর বলল, 'চলেন! উপরে আম্মু আছেন।'

মিজান তিন্নিকে দেখে খুবই অবাক হল। একমাসে সপ্তাহে শরীর-স্বাস্থ্যের কী হাল হয়েছে? সে কোনো সৌজন্যের ধারে কাছে না গিয়েই জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপা! আপনার কি স্বাস্থ্য খারাপ?'

তিন্নি ম্-ান হেসে বলল, 'না ঠিকই আছে। আপনি কেমন আছেন? ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন আজকাল?'

'তেমন ব্যস্ততা আর কোথায়? কিন্তু আপা, আপনাকে খুবই রোগা দেখাচ্ছে।'

'হঠাৎ জায়গা বদল হয়েছে, তার একটা রি-অ্যাকশান থাকবে না? এখানকার পানিটা আমার কাছে একটুও ভাল লাগে না। তা ছাড়া মেন্টালিও ভাল নেই!'

মিজান ভাবে, 'নিনি মনে হয় আসতে আসতে সবই বলে দিয়েছে।

সেটাও একটা কারণ হতে পারে। সে কেবল মাথা দোলায়। সহসা মন্তব্য করে না।

তিন্নি উঠে বলল, 'আপনি ফ্রেশ হয়ে খেয়ে রেস্ট নিন। অনেকটা পথ জার্নি করেছেন।'

টনি বলল, 'চলেন পুকুরে যাই। ঘাটলায় ছায়াতে বসে থাকতে ভাল লাগবে।'

তিন্নির চেহারা দেখে সে বুঝতে পারে যে, চিন্তা ভাবনার ভেতর তিনি খুবই এলোমেলো হয়ে আছেন। এখনও খুব দুশ্চিন্তায় আছেন তাহলে? এমনি নানা রকম ভাবতে ভাবতে মিজান টনির সাথে ঘাটলায় এসে বসে।

ছাত্রজীবনে যখন কবিতা লিখত, কতদিন এমন একটা সুন্দর নিবিড় পরিবেশের কথা ভেবেছে। মনেমনে এমন একটা জায়গার ছবি এঁকেছে। কিন্তু এতকাল পর সেই ভাবনা আর মনের ছবি মনেই আটকা পড়ে গেছে। ওগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে তেমন সময় এখন তার হাতে নেই। ইচ্ছে করলেও আর হবে না। সে নিজেই আজ বাঁধা পড়ে গেছে সময়ের কঠিন আবর্তনে।

মিজানের ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে পেছন থেকে নিনি বলে উঠল, 'এখানে বসে আছেন যে? ওদিকে খাবার সব পানি হয়ে যাচ্ছে!'

মিজান বলল, 'বসেন। জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে!'

নিনি ঘাটলার একটা সিঁড়িতে বসে বলল, 'এই জায়গাটা আমারও খুব পছন্দ! আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? পুরোনো যা কিছু আছে সব কিছু পড়ে থাক নদীর ওপার! আমরা এখানেই শুরু করে দেই নতুন আরেকটা জীবন!'

শীতের পাখিরা শিকারীর জালে ধরা পড়ে কেবল ডানা ঝাঁপটে পালক খসাতে পারে। কিন্তু মুক্তির কোনো পন্থা তাদের জানা থাকে না। মিজানের সামনে ঝলমলে জীবনের অঙ্গীকার নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আরেক জীবন। কিন্তু তার অভ্যন্তরের বন্দী পাখিটা কেবল ডানা ঝাঁপটায়। বোরোবার পথ খুঁজে পায় না। সে চুপ করে থাকে।

নিনি বলে, 'চুপ করে আছেন যে!'

'এখন আর স্বপ্ন দেখি না। দেখতেও চাই না!'

'স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে? স্বপ্ন দেখতে চান না কেন?'

'ভয়ে। স্বপ্ন ভাঙা যার নিয়তি, সে স্বপ্ন দেখতে সাহস পায় না!'

'আপনি খুবই অদ্ভুত করে কথা বলছেন!'

'ফিরবেন কখন? বিকেলে টুসি ফোন করবে বলেছিল।'

'করলে করবে। ফোন তো আপনার সঙ্গেই আছে।'

'কোনো জরুরি কাজে যেতে বলে যদি?'

'ভয় পাবেন না। আপনাকে আটকে রাখব না। কিন্তু আপাকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে আমার একটুও ভাল লাগবে না!'

'বেশ তো! এখানে ক দিন থেকে গেলে আপনার আপার বরং ভালই হবে!'

'আপনি সাপোর্ট দিচ্ছেন?'

মিজান মাথা দোলায়।

'ঢাকায় আপনার খারাপ লাগবে না?'

'যখন খারাপ লাগবে, তখন পালিয়ে চলে আসব।' বলে, মিজান হাসে।

মুন্সিগঞ্জ থেকে আসবার পর সত্যিই তার খারাপ লাগছিল নিনির জন্য। সেই বাড়িটার ভেতরকার ছবির মত সুন্দর পরিবেশের জন্য। কিন্তু অঞ্জলিকে নিয়ে তার রেকর্ডিং আর মহড়া নিয়ে আজকাল এতটাই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে, সময় কোথা দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে, উল্টে যেতে থাকে ক্যালেন্ডারের পাতা। পেরিয়ে যায় দুটো মাস। কিন্তু সে কিছুই ঠাহর করতে পারে না। অঞ্জলি খুব বেশি করেই যেন তাকে ব্যস্ততার ফাঁদে আটকে রাখছে ইদানিং। এরই মাঝে শত ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে একটু একটু করে টেলিভিশনের নতুন দুটি চ্যানেলে নিজের জায়গাটা পাকাপোক্ত করে নিতে পেরেছে অঞ্জলি। তবে সাফল্যের সাথেসাথে ব্যর্থতাও বুঝি মানুষের পিছু পিছু হাঁটে তার ছাঁয়ার কাঁধে ভর করে।

এত দিন রশিদের বাপ-ভাইদের কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। কিন্তু এখন তারা উঁজিয়ে এসেছে মাছের ঝাঁকের মত। রশিদের বাপ নাকি এসে বলে গেছে যে, তার মৃত ছেলের বিধবা গান-বাজনা আর ছেলে বন্ধু নিয়ে যদি দিনরাত মেতে থাকে তাহলে তাদের ছেলের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে না। কাজেই তাদের ছেলের বাড়িতে থেকে সে কিছুতেই এসব না-জায়েজ কাজ-কর্ম করতে পারবে না। তাকে এসব কাজ ছাড়তে হবে, নয়ত বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

মিজান পরামর্শ দিয়েছিল যে, অঞ্জলি যেন এ বাড়ি কিছুতেই না ছাড়ে।

কিন্তু সে শুনবে না কিছুতেই। আজও কথা হচ্ছিল এ নিয়ে। অঞ্জলি বলছিল, 'রাত হলে মনে হয় রশিদ আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে আসছে। বিশেষ করে বাড়িটাকেই আজকাল সহ্য করতে পারছি না!'

মিজান বলল, 'তুমি আসলে রশিদকে এখন ভয় পাচ্ছ। বাড়ির পুরোটাই রশিদের স্মৃতি ধারণ করে আছে। মনেমনে তুমি রশিদের দিক থেকে সরে

এসেছ অনেক দুর। আর সে কারণেই তোমার নিজের ঘরকে মনে হচ্ছে মৃত্যুপুরী।'

'তুমি মিছেমিছিই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ মিজান!'

'আমি দোষ চাপাচ্ছি?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকলো মিজান।

'তাই তো করছ! আমি যাকে এখন মনের ভেতর খুঁজে পাই না, তার স্মৃতি কেন আঁকড়ে পড়ে থাকব? আমার কি অধিকার আছে সে বাড়িতে থাকবার?'

'তুমি নিজে অধিকার ছেড়ে দিলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সৃষ্টি তাদের বংশধর। সে বাড়ি তার বাবার। সেই সূত্রে তার অধিকারটাই বড়।'

'সে বড় হয়েও নিজের অধিকার বুঝে নিতে পারবে। কিন্তু জোর করে আমি তার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে পারব না!'

'তুমি রশিদকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে।'

'এখনো ভালবাসি। কিন্তু আমারও তো এটা জীবন! নাকি? আমার সামনে যে দীর্ঘ পথ পড়ে আছে, তা একাএকা কেমন করে পাড়ি দেব বলতে পার? রশিদ মরে গেছে বলে কি তার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার স্বপ্ন আর কামনা-বাসনাগুলোও নিয়ে গেছে? আর সেটা হলেও না হয় কোনোভাবে নিজকে বয়ে বেড়াতে পারতাম। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? তুমি কি আমাকে পাগল হয়ে যেতে বলবে? পি-জ মিজান! আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো! আমাকে একটা বিধবা হিসেবে বিচার না করে একজন মানুষ হিসেবে ভাব! একজন রক্ত-মাংসের নারী হিসেবে ভাব!'

মিজান বলল, 'তুমি রেগে গেছ। দয়া করে শান্ত হও!'

'আমি কি অনুভূতিহীন, জড়-পদার্থ?'

'সে কথা বলছি না।'

'তাহলে কেন এমন একপেশে চিন্তা ভাবনা করবে? তোমার উপর ডিপেন্ড করেছিলাম বলেই কি আমি শুধু তোমার করুণার পাত্রী?'

মিজান কী বলতে পারে আর? অঞ্জলিকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না যে, সব মানুষ একরকম হতে পারে না। তবুও বলে, 'তোমাকে করুণা করেছি এ ধারণা কেন হল?'

'তাহলে কোন অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে যাও? আর্থিক সংস্থান হলেই কি একটা মানুষের সব প্রয়োজন মিটে গেল?'

মিজান বুঝতে পারে যে, অঞ্জলি আজ যা বলছে, তা বেশ কিছুদিন খুব

ভাল করেই ভেবেছে। আর তাই কথা-বার্তার ভেতর দিয়ে সে তার অন্তর্গত ইচ্ছে আর স্থূল অভাব বোধটাকেই তুলে ধরতে চাচ্ছে। কিন্তু বন্ধুপত্নীকে আর যাই হোক সে অমন স্থূল দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারবে না কখনোই।

অঞ্জলির দিকে তাকাতে পারছিল না মিজান। কিন্তু অঞ্জলি কিছু আর বলছে না দেখে সে মুখ তুলতেই দেখল, অঞ্জলি মাথা নিচু করে দু হাতের তেলোতে ধরে আছে কপালের দু পাশ।

মিজান ঘড়ি দেখে মনেমনে আৎকে উঠে। রাত বেড়ে গেছে অনেক। বলল, 'অঞ্জলি, মাথা ঠান্ডা রাখো। তোমার রেকর্ডিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। শুরুটা সুন্দর ভাবে হয়েছে বলেই আমি চাচ্ছি শেষটাও তেমন ভাবেই হোক।'

অঞ্জলি মাথা তুলে বলল, 'হ্যাঁ। শুধু কথায় কি চিড়ে ভেজে? তুমি চাচ্ছ এটাই। কিন্তু রাত তো অনেক হয়ে গেছে। আজ আর গিয়ে কাজ নেই। থেকে যাও না! পি-জ!'

অঞ্জলির এমন সকাতর অনুনয় সে প্রতিবারই জোর করে উপেক্ষা করে যায়। কিন্তু আজ সে তেমন করল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, তুমি তো জানোই যে, আমাকে আজ যেতে হবে। কত কাজ জমে আছে!'

অঞ্জলিও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আয়নায় তো নিজের চেহারাটা একবারও দেখ বলে মনে হয় না। চুলে চিরুনি দাও না কত দিন, তাও বলতে পারবে না। পরের জন্য কেবল খেটেই যাবে? কিছু আশা করবে না?'

মিজান এক পা বেড়ে গিয়ে আবার ফিরে বলল, 'চাষী তার জমিতে যখন খাটা-খাটনি করে তখন তার মনে কি কোনোই আশা থাকে না? থাকে। আমি নৈরাশ্যবাদি নই। কেন হতাশ হও?'

অঞ্জলি হঠাৎ মিজানের দুহাত আঁকড়ে ধরে বলে, 'তাহলে আজকের রাতটা কী দোষ করল? বাইরে আজ পূর্ণিমা। সারারাত তোমার সাথে কথা বলব। রাত আরো গভীর হলে একটু একটু ঠান্ডা পড়বে। একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরে ওম নেব!'

মিজান অঞ্জলির হাতের মুঠি থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। কিন্তু অঞ্জলি তাকে জড়িয়ে ধরে। তবে, মিজানের পিঠের দিকে তার মুখটা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। মেঘের ফাঁক দিয়ে যেন হেসে উঠল সূর্যের সহস্র কণার দ্যুতি। মিজানের কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, 'ভেতরে ভেতরে তুমি এত পাষাণ?'

অঞ্জলির পিঠে হাত ছুঁইয়ে মিজান বলে, 'হ্যাঁ। আমি খুবই পাষাণ!'

তারপর আবার বলল, 'আর কোনো দুঃখ, ঝগড়া কিংবা রাগ নয়। কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হোক!'

অঞ্জলি মিজানকে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'কত সুন্দর একটা মুহূর্ত তৈরী হতে পারত আর সেটাকে ভেঙে-চুড়ে চলে যাচ্ছ!'

'যাচ্ছি তো ফিরে আসবার জন্যেই!'

অঞ্জলি নাচের ভঙ্গিতে হালকা পদক্ষেপে মিজানের সাথেসাথে দরজা পেরিয়ে গেট পর্যন্ত আসে। কিন্তু মিজান বেরিয়ে যাবার সাথেসাথেই গেটটা বন্ধ করে দেয় না। একটু ফাঁক করে তাকিয়ে থাকল মিজানের চলে যাওয়ার দিকে।

আট

'ছি ছি মিজান!'

টুসি প্রায় চিৎকার করে উঠল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মিজান হা করে তাকিয়ে থাকল টুসির মুখের দিকে। ভাবল, কী এমন ছি ছি কান্ডটা সে করল?

'তুমি জানো আমি বিবাহিতা একটা মেয়ে। আমার স্বামী আছে, সংসার আছে। আমি যদি আমার স্বামী সংসারের কাছে মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলেই যাই, সেটাকে তুমি অভিসারের সাথে তুলনা করবে?'

মিজানের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যবসার খাতিরে, কোম্পানির স্বার্থে আমারও জানা দরকার গোপনে তুই কোথায় যাস? কি করিস?'

'বেশি শিখে ফেলার ভান করবি না। খবরদার! আমি ছুটি কিভাবে কাটাব তোমাকে বলে যাব? অঞ্জলির সাথে কিসের এত ফুসুর-ফাসুর তা কখনো জানতে চেয়েছি? নিনির বাড়িতে এক সপ্তাহ ঘরজামাইর মত কাটিয়েছ, কখনো কি জানতে চেয়েছি ওখানে তুমি কি কর?'

বুলি টুসির কথা শুনছিল আর মিজানের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছিল।

মিজান বলল, 'তুই হাসছিস কেন? খুব মজা পাচ্ছিস?'

টুসি বলল, 'ও মজা পাবে কি? স্বামী-সন্তানহীনা এতিম মানুষ! মজা পেয়েছ তো তুমি। নিনির হাসবেন্ড ওকে তাড়িয়েছে কেন জানো?'

'তাড়িয়েছে মানে? মিজানের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'এক রকম তাড়িয়ে দেয়াই!'

'বুঝলাম না।'

মিজান টুসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বুঝবে কি করে? বুড়ো-হাবড়া কোথাকার! আড়াইদিন সংসার করে কি বুঝবে যে, সংসারের ভেতরে ভেতরে কত রকম সমস্যা! কত রকমের ভাঙন! এই যে নিনি, তার হাজবেন্ড ওখানে বলে বেড়াচ্ছে নিনির কোনো বাচ্চা-কাচ্চা হবার আশা নেই দেখে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন ইটালিয়ান এক ফকিন্নিকে গলায় ঝুলিয়েছে। আর এদিকে তুমি ওই বাঁজা মেয়েটার সাথেই... যত্তসব!'

টুসি কথা শেষ করে না।

মিজান টুসির কণ্ঠে কিছুটা রাগের আভাস পেল যেন। বলল,' টুসটুসি বেগম! চান্স পেয়ে খুব এক চোট ঝাড়লি আমার উপর! তোরা এত এত পড়া-শুনা করে দেশ-বিদেশে ঘুরেও যদি গ্রাম্যতা বিসর্জন দিতে না পারিস তাহলে সেটা শিক্ষার দোষ হতে পারে না! তুই যে বললি, তা যদি কোনো অশিক্ষিত মেয়ে বলত, তাহলে ভাবতাম মুর্খ বলেই এমন কথা বলতে পারছে। কিন্তু তোর বেলা তো আমার এমন ধারণা হওয়া উচিত না। তবুও ধারণাটাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না!'

বুলি বলল, 'আবার কি লেকচার মারতে চাচ্ছ?'

'লেকচার না বলে বল বিশে-ষণ!'

'আহারে পন্ডিত!' টুসি ফোড়ন কাটে। বলে, 'অনার্সে থার্ড ক্লাস। মাস্টার্সে গোল আলু!'

মিজান বলল, 'গোল আলু পন্ডিটির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হওয়ার কথা না। আরজ আলি মাতুব্বর য়্যুনিভার্সিটির কোনো বড় ডিগ্রি নিতে পারেননি। অথচ তাঁর লেখার ওপর এখন অনেকেই থিসিস করছে!'

'ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বল।'

'কথা হচ্ছে যে, একটা মেয়ে যখন বাঁজা হয় সেটা কি তার নিজের দোষে হয়? নাকি মা হলে সেটা নিজের যোগ্যতায় হয়?'

'ওসব তর্কে যেতে চাচ্ছি না!' টুসি সাবধানী গলায় বলে, 'বলা যায় না কখন আবার বলে বসবে অফিসকে বানিয়েছি পরচর্চার কারখানা!'

'খুব ভাল বলেছিস। মাথাটা একটু ধীরে হলেও কাজ শুরু করেছে!'

টুসি বুলির দিকে ফিরে বলল, 'কেমন শয়তান দেখলি?'

'ওর সাথে লাগতে যাস কেন? জানিস তো কথায় পারবি না!'

'সেটা ভুলে গেলে ওকে বেশি রকম পাত্তা দিয়ে ফেলা হবে।'

'পাত্তা তো দিয়েই রেখেছিস। আর কবে পাত্তা না দিবি?'

'তুই কি চাস এমন একটা সম্ভাবনাময় ছেলে আস্তাকুড়ে পড়ে থাকুক?'

'আস্তাকুড় থেকে তুলে এনে যতই সুগন্ধি মাখাস না কেন, আস্তাকুড়ের গন্ধ কিছুতেই যাবে না!'

'তবু একটা চেষ্টা বলতে পারিস। চেষ্টা করলে অনেক অসাধ্য সাধন হয়!'

বুলি বলল, 'অনেক বকবক হয়েছে! এবার কাজের কথা বলি!'

মিজান বলল, 'খালি মুখে কাজের কথা?'

টুসি আবার জ্বলে উঠল যেন। 'তোমার এই খাইখাই স্বভাব কবে যাবে বল তো?'

মিজান হাসল। বলল, 'আমি যেদিন কবরে যাব।'

টুসি ইন্টারকমের বোতাম টিপে কফির কথা বললো।

বুলি টেবিলের ওপর কাচের বলটা ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, 'মেম্বার অব ডিরেক্টরস্ হিসেবে মিজানকে জানানো উচিত যে, আমরা এ পর্যন্ত কত আর্ন করেছি। আর প্রফিট হয়েছে কত!'

টুসি বলল, 'আমরা না বললে, ও কখনোই জানতে চাইবে না যে, আমাদের কোম্পানির বর্তমান পজিশন কি?'

'জেনে আমার লাভটাই বা কি?'

বুলি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'লাভটা কি মানে?'

'আমি হলাম এখানকার অনারারি ডিরেক্টর। তোদের দুজন ছাড়া বাকি লোকগুলোকে কখনোই দেখিনি। তা ছাড়া আমার পার্সেন্টের কথা এগ্রিমেন্টেই লেখা রয়েছে। কাজেই আমার বাড়তি কৌতুহল কেন থাকবে?'

'থাকা উচিত এ জন্যে যে, সেখানে আরো একটা কথা লেখা আছে, তিন মাসের ভেতর যদি কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় কোনো সাফল্য দেখাতে পার তাহলে পূর্ণ মর্যাদায় বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সদস্য করে নিতে পারব।'

তাদের কথার মাঝেই পিয়ন মুনাফ কফি দিয়ে গেল।

মিজান কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমার এতসব ভাল লাগে না। ওই সব ফুটানিঅলা চাল-চলন আমার অসহ্য। তোদের জ্বালায় আমি রাস্তায় ইচ্ছে মত হাঁটতে পারি না। রিকশায় চড়ে শহরে ঘুরতে পারি না। কোনো সস্তা হোটেলে গিয়ে বা রাস্তার পাশের স্টলে বসে চা-পুরি-সিঙ্গাড়া খেতে পারি

না। রাস্তা-ঘাটে অফিসে সারাক্ষণ স্যুট-টাই পড়ে ফিটফাট হয়ে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। অঞ্জলির রেকর্ডিং শেষ হয়ে গেলে আমি আর তোদের সাথে নেই! আমার আগের জীবনই ভালো ছিলো!'

মিজানের কথা শুনে দু বান্ধবী কাম ডিরেক্টর পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কিন্তু কিছু বলে না।

মিজান ওদের নিরবতায় আবার বলল, 'কি বলেছি আশা করি দুজনেই বুঝতে পেরেছিস!'

টুসি বলল, 'তাহলে আমাদের দুঃখ পাওয়া ছাড়া কিছু করবার নেই। কারণ, তোমাকে পাবার পর থেকেই আমাদের ব্যবসা গতি পেতে আরম্ভ করেছিল। তোমার এ্যাবসেন্সে আমাদের পূণর্মুষিকে পরিণত হতে হবে!'

মিজান কফি খাওয়া থামিয়ে বলল, 'একটু বুঝিয়ে বল দেখি!'

'যেমন এখন অডিও আর এ্যাডের দিকটা তুমি দেখছিলে। বুলি সামলাচ্ছে ফিনান্সিয়াল দিকটা। আমি দেখছিলাম ইমপোর্ট এক্সপোর্ট। সাদী সাহেব দেখছিলেন কনস্ট্রাকশনের দিক। মাহমুদ আর ওবায়েদ সাহেব দেখছিলেন হোটেল আর গার্মেন্টস। তুমি না থাকলে আমাদের দুজনকেই তোমার কাজগুলো ভাগ করে নিতে হবে। কমে যাবে আমাদের সময়। কাজের পরিমাণটাও তেমনি কমে আসবে।'

মিজান অবাক হয়ে বলল, 'আমি যে এত কাজের তা তো কখনো বলিস নি!'

'আমাদেরও কি খেয়াল ছিল নাকি? তুমি কথাটা বললে বলেই না প্রসঙ্গটা উঠল।'

'তাহলে কি করে যাই?'

টুসি আগ্রহ নিয়ে বলল, 'সবচে মজার কথা কি জানো? আমাদের লাভের মেজর পার্সেন্টটা এসেছে তোমার সেকশন থেকে।'

বুলি বলল, 'মজার ব্যাপার আরেকটা আছে।'

মিজান বলল, 'শুনি তো!'

'আমাদের কনস্ট্রাকশন সেকশনে লোকজন সবচে বেশি। পঁচাশি জন। সেখান থেকে আর্ন হয়েছে থার্টি পার্সেন্ট। তোমার সেকশনে লোক মাত্র ছয় জন। সেখান থেকে এসেছে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট। দুটোর অনুপাত তাহলে কত হল?'

মিজান মাথা চুলকে বলল, 'এই রে! হিসেব-পাতির ব্যাপার হঠাৎ সামনে এলে আমার কান গরম হয়ে উঠে। এখনো তেমনি হচ্ছে!'

বুলি মিজানের হাতে হাত রেখে বলল, 'তুমি থেকে যাও আমাদের সঙ্গেই। তোমার পার্সোনাল লাইফে তো আমরা বাগড়া দিচ্ছি না! কিন্তু অফিসিয়াল আওয়ারটা তুমি আমাদের রুলের বাইরে কাটাতে পারবে না। শুধু তুমি কেন, আমরাও কেউ পারি না!'

টুসি বলল, 'তোমাকে স্পেশাল একটা সুবিধা দিতে পারি এই যে, তুমি তোমার মত করে কাজ করবার খাতিরে যেভাবে প-্যান করবে সেভাবেই আমরা তোমাকে হেল্প করব।'

'এমন হলে কোনো অসুবিধা নেই। তোদের সিডিউল মেনটেইন করতে আমার জান তেজপাতা হয়ে গেছে!'

'তোমার সিডিউলেই তুমি চলবে। মিটিংগুলো সেভাবেই এ্যারেঞ্জ করবে।'

মিজান হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে তোদের সাথে থাকা যাবে মনে হয়!'

বুলি তেমনি গম্ভীর ভাবেই বলল, 'থেকেই যাও!'

মিজান চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বলল, 'আমাকে কি দিন দশেক ছুটি দেয়া যাবে?'

টুসি আৎকে উঠে বলল, 'এই সময়? তাও আবার দশদিন!'

মিজান বলল, 'না না। এখনকার কথা বলছি না!'

'তাহলে?'

'অঞ্জলির গানগুলোর রেকর্ডিং শেষ হলেই।'

বুলি বলল, 'দেশের বাইরে যাবে নাকি?'

'না। দেশেই।'

'এত লম্বা সময় কি করবে তুমি?'

'রেস্ট নেব। নির্জন কোথাও চলে যাব।'

টুসি কেমন সরু ভাবে তাকাল মিজানের দিকে। কি ভাবল কে জানে!

তারপরই কেমন অস্থির হয়ে উঠে বললো, 'স্ক্যান্ডালে পড়ে পাগল হয়ে যাবে। তুমি ক'জনের মুখ বন্ধ করতে পারবে? পত্রিকাওয়ালারা টের পেলে তোমাদের নিয়ে রসের পায়েস বানাবে। ওদের তো চেনো না!'

বুলি বলল, 'তাহলে কিছু দিন পরেই না হয় আতা খানের সাথে অঞ্জলির কন্ট্রাক্টটা সাইন করাব। তবে ওকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। মিজান আগে ফিরে আসুক।'

টুসি বলল, 'হাতে তো তেমন সময় নেই।'

মিজান হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাই।'

টুসি বলল, 'হিসেবটা জানবে না?'

'তোরা আমার বন্ধু রয়েছিস কি জন্য? ঠকানোর মতলব থাকলে কি মালিবাগের ডোবা থেকে ইস্কাটনে তুলে আনিস?'

কাউকে কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে মিজান বেরিয়ে এল রুম থেকে।

তারপর রাস্তায় একটা খালি স্কুটারকে হাত তুলে থামায়। একবার স্টুডিওতে যাওয়া দরকার। চার্টে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। আর এই পরিবর্তনটা সে বুলি বা টুসিকে জানাতে চায় না। আগামীকাল রেকর্ডিং আছে।

তিন চার দিনেই অঞ্জলি বাকি গানগুলো কমপি-ট করে ফেলল। শেষ দিন স্টুডিও থেকে বেরিয়েই বলল, 'আমার প্রস্তুতি শেষ। এবার তোমার প্রস্তুতি। এই কদিন আর বাড়ি থেকে বেরোবো না। তোমার হাতের কাজগুলো গুছিয়ে নিয়েই আমাকে বলবে। মা বেটিতে চলে আসব।'

মিজান বলল, 'আমার কাজ গোছানোর তেমন কিছু বাকি নেই। আট-দশদিন এমন কিছু না। তুমি আগামী রোববারে তৈরী হয়েই থেকো। বেলা এগারটার ফ-াইটের টিকেট কনফার্ম করা আছে।'

'আমি বোরখা পরে নেব। নইলে রিপোর্টাররা পিছু নিতে পারে।'

মিজান বলল, 'গুড আইডিয়া! আজ ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। এর মাঝে তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে না। মানে তোমার ওখানে যাচ্ছি না।'

'আচ্ছা।'

মিজান একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে অঞ্জলি আর সৃষ্টিকে তুলে দিল। যাবার সময় ওরা দুজনেই হাত নাড়ে মিজানের উদ্দেশ্যে।

ঘরে ফিরে ভীষন ক্লান্ত বোধ করে মিজান। আজকাল ব্যাপারটা খুবই বিব্রত করে তাকে। সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, এমন একটা ভয় শিরশির করে তার মনের ফাঁক-ফোঁকরে ঘুরে বেড়ায়।

পরনের কাপড় ছেড়ে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নেয়। তারপর ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ারের টিন নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ারের টিন খুলে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে প্রায় অর্ধেক গিলে ফেলে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের সাথে কথা বলে। বুড়িয়ে যাচ্ছি? কোই, চেহারা তো কিছু বলে না। তবে মাথায় বেশ কয়েকটা পাকা চুল দেখতে পায়। সে হাসে। নিজেকে বলে, শালা বুড়া!

তারপর শাওয়ার ছেড়ে সিক্ত হতে হতে বিয়ারে চুমুক দেয় অল্পঅল্প করে। গায়ে ঠান্ডা পানি আর পেটের ভেতর ঠান্ডা বিয়ার। শরীর থেকে ক্লান্তি

ঝরে পড়ে নিমেষেই।

বাথরুম থেকেই সে ফোনের রিং বাজতে শোনে। কিন্তু কোনো আগ্রহ বোধ করে না। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ফোনটা আবার বেজে ওঠে। কয়েকবার বেজে আবার থেমেও যায়।

গোসল শেষ হলে শরীর-মাথা মুছে ভেজা তোয়ালেটাই আবার কোমরে পেঁচিয়ে বের হয় সে ।

তারপর ফোনের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কেউ তাকে জরুরি ভাবে পেতে চাইলে অবশ্যই আবার চেষ্টা করবে।

ফোন আবার বেজে ওঠে।

সে ফোন তুলে, 'হ্যালো, মিজান স্পিকিং!' বলতেই নিনির কণ্ঠ শুনতে পায়।

'হ্যালো, আমি নিনি। আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? সেই কখন থেকে ট্রাই করছি!'

'বাথরুমে ছিলাম।'

'আপনি কি এখন ফ্রি আছেন?'

'আপনি কোত্থেকে?'

'বাসায়। ঢাকাতে।'

'কখন এসেছেন?'

'এই সন্ধ্যার একটু আগেই। আপনি চলে আসেন এক্ষুনি। সিকিউরিটিকে বলে রাখছি। দেরি করবেন না কিন্তু!'

'এক্ষুনি কেন? এমন কি জরুরি কাজ পড়ল?'

'আরে আসেন না! তারপরে শুনবেন আস্তে ধীরে।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি। ঘন্টা খানেক লাগবে।'

নিনি মিজানের অপেক্ষাতেই ছিল। আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, মিজান কখন আসে।

মিজান গেটের কাছে আসতেই বারান্দায় দাঁড়ানো নিনি হাত তুলে নাড়ল। নতুন সিকিউরিটির উদ্দেশ্যে বলল, 'এ হচ্ছে মিজান। গেট খুলে দাও।'

মিজান ভেতরে প্রবেশ করেই দেখতে পেল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে নিনি।

তারপর সিঁড়ির মুখে লাগানো বাড়ির কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে গেট টেনে বলে, 'সেই কখন থেকে ওয়েট করছি!'

ভেতরে ঢুকে নিজেই গেট টেনে ভিড়িয়ে দেয় মিজান। বলে, 'এমন বেশি দেরি হয়নি। কারো আশায় থাকলে এমনই মনে হয়!'

'তা অবশ্য ভুল বলেননি!' বলে, নিনি তালা আটকে দিয়ে মিজানের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আসেন।'

উপরে এসে মিজান বলল, 'আমাকে যে আসতে বলেছেন কিছু রান্না-বান্না করেছেন?'

'সে চিন্তা আপনার করতে হবে না। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি বসে যেতে পারেন।'

মিজান কিছুটা অবাক হয়ে দেখে নিনিকে। আগের চেয়ে মনে হয় অনেক প্রাণবন্ত। চেহারার লাবণ্যও যেন বেশ খানিকটা ফিরে এসেছে। শেষটায় সে বলে ফেলল, 'আপনি আপার ওখানেই ভাল ছিলেন!'

'আমিও বুঝতে পারছি কি বলবেন!'

'কি বলব?'

'সুন্দর হয়েছি! আরো হাসি খুশি হয়ে উঠেছি! এই তো?'

তারপর মিজানের একটা হাত ধরে নিনি বলল, 'আপাও কদিন ধরে এমন কথাই বলছিল।'

মিজান খাবারের টেবিলে বসে পড়ে বলে, 'ডিশগুলো খালি নেই তো?'

'না।' বলে, নিনি একটা খালি পে-ট এগিয়ে দেয় মিজানের সামনে।

মিজান বলল, 'আপনি খাবেন না?'

'খেতে একদম ভাল-াগে না!'

ডিশের ঢাকনা খুলে মিজানের পে-টে খাবার তুলে দেয় নিনি।

তরকারির গন্ধে হঠাৎ করেই ক্ষিধেটা বেড়ে গেল যেন। 'ওহ্ ভূনা মাংস? দারুণ!'

মিজান খাওয়া শুরু করে দেয়।

তারপর বলে, 'এর মাঝে এক দিনও আমার খোঁজ নিলেন না কেন?'

'আমার খোঁজ নিয়েছেন? কেমন আছি, তা একবার দেখতেও তো গেলেন না!'

'আমি কেন যাইনি সেটা বলব। কিন্তু আপনার কি হয়েছিল? একটা ফোন করলেও তো পারতেন!'

'আমার মন বলছিল যে, আপনি খুবই ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে সময় পার করছেন। আমার কথা মনেই নেই!'

মিজান একবার হেসে বলল, 'সত্যিই! মনে ছিল না।'

'এতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আপনাকে ফোন করিনি ঠিকই। কিন্তু আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন কেবল আপনিই!'

'আমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন দেখছি!'

'খাচ্ছিই তো! আর খাবনাই বা কেন? আমি যে এখন আপনারই একটা সংস্করণ বয়ে বেড়াচ্ছি।'

'তা ঠিক!' বলেই মিজান বিস্ময় নিয়ে নিনির দিকে তাকাল। 'মানে?'

'মানে নেই কোনো! সংস্করণের মানেটা তেমন কঠিন না!'

মিজান বলল, 'এর মানে তো দাঁড়াচ্ছে আপনার পেটে আমার অস্তিত্ব। আপনি মা হচ্ছেন?'

মিজান আচমকা খাওয়া ফেলে নিনির পাশে চলে এল। 'কি বলছেন আপনি?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলে, নিনি তার হাঁটুর কাছ থেকে জামার প্রান্তটা তুলে আনল বুকের কাছাকাছি।

সাদা মসৃন পেটের দিকে তাকিয়ে মিজান কিছু বুঝতে পারল না। বলল, 'বসে বসে কতগুলো চর্বি জমিয়েছেন কেবল।'

'আরে না পাগল! চর্বিঅলা পেট কি এমন টানটান আর এমন সাইজ হয়? এই সাইজটা দিন যত যাবে ততই বাড়তে থাকবে!'

তারপর, 'এই দেখেন,' বলে, নিনি মিজানের বাঁ হাতটা নিজের পেটের উপর রেখে বলল, 'চর্বি থাকলে চামড়া ঢিলে আর ভারি মনে হত না?'

মিজান নিনির পেটে হাত বুলিয়ে বলে, 'কী অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য! আমি বাবা হব?'

নিনি বলল, 'যান তো! খাওয়া শেষ করেন আগে!'

মিজান ফিরে গিয়ে আবার খাবারের পে-ট সামনে নিয়ে বসে। বলে, 'আমার খেতে একদম ইচ্ছে করছে না!'

'ইচ্ছে না করলেও খেতে হবে!'

মিজান খাওয়া শুরু করতেই আবার টের পায় যে, ক্ষিধেটা তার এখনো মরে যায়নি।

'আমার মনে হচ্ছে এটা আপনার ভুল ধারণা।'

নিনি রেগে উঠে বলে, 'মা হচ্ছি আমি। আর আপনি বলছেন ভুল ধারণা! আমার প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট মিথ্যে? বাজারে যেই প্যাকেটটা পাওয়া

যায় তা দিয়ে আমি নিজেও একবার টেস্ট করেছি। সেটাতেও পজেটিভ!'

মিজান খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে সেখানেই।

নিনি পে-ট চামচ ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখে।

মিজান উঠে নিনির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'একদম প্রথমটায় কি করে বুঝলেন যে, আপনি কনসিভ করেছেন?'

'আরে সেটাও একটা মজার ঘটনা!' বলতে বলতে নিনি গিয়ে সোফায় বসল।

মিজানের ইচ্ছে হয় খবরটা সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়। সে নিনির পাশে গিয়ে গা ঘেঁষে বসে। 'বলেন না ঘটনাটা!'

'আপনি চলে আসবার পরে নেক্সট পিরিয়ডের সময় সেটা আর টাইমলি শুরু হল না। ভাবলাম এমনিই বুঝি। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক আগেই হঠাৎ করে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল আর পেটের ভেতর থেকে ঠেলে বমি উঠে আসতে লাগল। ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ভিটামিন আর বমির ট্যাবলেট দিয়ে দিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। তিন দিনের মাথায় মাঝরাতে আপা এসে আমার পাশে বসে মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোকে একটা কথা বলি?'

বললাম, 'বল না কি বলবে?'

'আপা কেমন যেন দ্বিধায় ভুগছিলেন। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে শেষটায় বললেন, যদিও কথাটা তোকে এক হিসেবে বলা উচিত হবে না। কিন্তু আমর মনে হচ্ছে অনুচিত হলেও বলাটা ভুল হবে না।'

বললাম, 'তুমি বল। আমি কিছু মনে করব না!'

'তাহলে সত্যি করে বল' তুই কারো সঙ্গে সেক্স করেছিস? কোনো প্রোটেকশান ছাড়া?'

বললাম, 'হ্যাঁ। মিজানের সাথে পাঁচ-ছদিন...। আমি কথা শেষ করবার আগেই আপা ছিছি করে উঠলেন। আমাকে বললেন, তুই নষ্ট হয়ে গেলি? আমি কিন্তু তখনো কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? আপা ঘৃণায় মুখ কাল করে বলে উঠলেন, তুই তোর অপকর্মের ফল পেয়েছিস। তোর পেটে মনে হয় ইলিগ্যাল বাচ্চা চলে এসেছে!'

নিনি একবার হেসে কপালের উপর থেকে চুলগুলো ঠেলে কানের পাশে গুঁজে দিয়ে আবার বলে, 'আপাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি মা হচ্ছি? কালই টেস্ট করাব! তারপর আমাকে অসভ্য, বেশরম বলে, তিনি রাগ করে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। পরদিন টেস্টের রিপোর্ট পেয়ে জানেন

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম! মনে হয়েছিল মা হতে পারাটা সত্যিকার অর্থেই নারীজীবনে একটা বিরাট পাওয়া! বুঝতে পারছিলাম যে, বন্ধ্যাত্বের অপবাদ আমার ঘুঁচে যাবে। নারী জনমের ব্যর্থ হাহাকার আর গুমরে মরবে না আমার হৃদয়ের বন্ধ প্রকোষ্ঠে! আমি মা হতে পারবো? সৃষ্টিকর্তাকে বললাম, প্রভু! আমার জঠরে যদি কাউকে পাঠালেই, তাহলে তাকে তুমি নিরাপদ রেখো। নিখুঁত রেখো। আমার অহঙ্কারকে খর্ব কোরো না!' বলে, নিনি যেন আবার দম নেয়।

তারপর, 'আপাকে রিপোর্টের কথা বলতেই নিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললাম, আপা, শুধু তুমি কেন, সমগ্র পৃথিবী যদি আমার দিক থেকে আজ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবুও আমি চাই এই অপকর্মের ফসল পৃথিবীতে আসুক! সে হবে আমারই সন্তান! একান্তই আমার!'

মিজান নিনির পেটের ওপর হাত রেখে বলল, 'সত্যিই কি একান্ত আপনার?'

নিনি মিজানের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে,' আমারই তো! আর কার অধিকার আছে?'

নিনির আচরণে আহত হয়ে মিজান বলল, 'নেই কেন? ও তো আমারও সন্তান!'

'কক্ষনো না!' বলে, নিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

এক হাত দিয়ে পেট আড়াল করে একটু পিছু হঁটে যায়। যেন কোনো এক দুর্বৃত্ত ছুটে আসছে তার অনাগত সন্তানকে কেড়ে নিতে। সে অবস্থায়ই নিনি আবার বলে, 'এ সন্তান কেবলই আমার!'

তারপর মিজানের দিকে পেছন ফিরে ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, 'এ শিশু তো আপনার বর্জ্য! কেবলই বর্জ্য! ওকে সজ্ঞানে আপনি আমার জমিতে বপন করেননি। ও আমার চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফসল!'

'কেন অমন কথা বলছেন?'

নিনির নিদারুণ তিক্ত আর নির্মম কথার আঘাতে মিজানের দু চোখ ছাপিয়ে কান্না চলে আসবার উপক্রম হয়।

নিনি বলেই চলেছে, 'কারণ, আপনি জানতেন আমার কোনো বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। তাই নির্ভয়ে আর নিশ্চিন্তে আমাকে ভোগ করেছেন। বাচ্চা হবার রিস্ক আছে জানলে আপনি ডেফিনিটলি কোনো না কোনো প্রটেকশান নিতেন!'

মিজান অপমানের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলল, 'পি-জ! অমন ভাবে

বলবেন না। আমার মনে এত কিছু ছিল না। নতুন করে জীবন শুরুর কথা আপনিই তো আমাকে বলে ছিলেন! বলেননি?'

নিনি হঠাৎ হেসে উঠল। 'তা অবশ্য ঠিক! আমিই বলেছিলাম।'

'বলেছিলাম মানে কি? আমি আপনার কথাতেই এগিয়ে এসেছি। নতুন একটা জীবনের লোভ আপনি আমাকে দেখান নি? আমার পৌরুষের প্রতিরোধ কে ভেঙেছিল? আপনি না আমি?'

'না। সত্যি বলতে কখনোই ভয় পাব না। প্রতিরোধ আমিই ভেঙে দিয়ে ছিলাম। আপনার মন মত করে, আর্টিস্টিক ভাবে নিজকে আপনার টোপ হিসেবে তুলে ধরেছিলাম। আমার স্বপ্ন দেখায় কোনো ছল-চাতুরি ছিল না। ভালবাসাতেও কোনো খাদ ছিল না। এখনও নেই। যে আসছে, আমাদের সমাজে তার মাথা নিচু হতে দেব না। আপনার স্বীকৃতিও তার প্রয়োজন হবে। আমারও প্রয়োজন হবে। তবে তার আগে একবার আমাকে টুটুলের সাথে শেষ বোঝাপড়াটা করতে হবে।!'

নিনি তার পেটে হাত দিয়ে হয়ত অনাগত শিশুর অস্তিত্ব অনুভব করে বলে, 'তাকে গিয়ে বলব এই দেখ, তুমি বলেছিলে আমি মানসিক রোগী। আমার মা হবার কোনো যোগ্যতাই নেই! কিন্তু আমার সমগ্র অস্তিত্বে জোয়ার বইয়ে দিয়ে আজ নিজের অস্তিত্ব সগর্বে যে জাহির করছে, সে কে? আমার অযোগ্যতা না তোমার অক্ষমতা?'

মিজান কিছুটা ভয়েভয়ে নিনির কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'এ সময় উত্তেজিত হলে অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে। শান্ত হন, পি-জ!'

নিনি মিজানের মুখোমুখি হয়ে বলে, 'আমি তো শান্ত হয়েই আছি। আপনাকে আমি কোন মুখে ছোট করব? আমার মাথায় মা নামের যে অমূল্য মুকুটটা মহান সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছে করলে পরিয়ে দিতে পারেন, সে মুকুটের বাহক তো আপনিই!'

সে মুহূর্তে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যেতেই ওরা দুজন ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারে। কিন্তু বাইরে ছিল ফুটফুটে জোছনা। আর সে জোছনার নিবিড় আলোয় মিজান দেখতে পেল, নিনির দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়া আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে।

***

জুলিয়ান সিদ্দিকী।

এটি লেখকের ছদ্ম নাম।
ছাত্রজীবনে ১৯৮৬তে স্বনামে কুমিল-ার সাপ্তাহিক **আমোদ** পত্রিকায় **একাত্তরের স্মৃতিচারণ** দিয়ে লেখালেখির শুরু।
কিছুকাল অবৈতনিক সংবাদদাতার কাজও করেন এ পত্রিকায়। তবে গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করেন ২০০৫ইং সালে।
লেখকের জন্ম ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৮ তে, পাবনা জেলার পাকশী টাউনে। কিন্তু পৈতৃক গ্রাম কুমিল-ার মুরাদনগর থানার দড়ানিপাড়ায় বসবাস করেছেন কিছুকাল। লেখাপড়া ***গুমতা ইসহাকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়***, এক বছররের মত ***গৌরীপুর মুন্সি ফজলুর রহমান কলেজে*** এবং পরে **নিমসার জুনাব আলি কলেজ** হয়ে ঢাকার ***জগন্নাথ কলেজ*** অবধি করেছেন।
সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়ালেখা করলেও পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কম্পিউটারকেই। জীবিকার তাগিদে লেখক বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন।

প্রকাশিত উপন্যাস:

১। ভালোবাসার যাতনা যত। ২০০৫।
নন্দিতা প্রকাশ, ১১/১২, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

juliansiddiqi@gmail.com